মাটি ও সার

(দ্বিতীয় ভাগ)

সার

বিশ্বাস

মাটি ও সার

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন বিশ্বাস, বি, এস, সি, এম, এ, (কলিঃ)
এম, এস (আমেরিকা)
ভারতীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ের মৃত্তিকা জরিপ সহকারী
'মাটি ও সার' ১ম ভাগ প্রণেতা

মূল্য ২. ৫০

প্রথম প্রকাশ—দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীইন্দ্রনীল বিশ্বাস
৬৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪
(৪নং ফর্ম্মা হইতে)

প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিঃ
১ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ও প্রকাশকের নিকট

মূল্য দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা

সার

সার বলতে আমরা কি বুঝি

সার কথাটি আমাদের দেশের কৃষকের কাছে আদৌ নূতন নয়। সার অর্থ আসল। লোকে চলতি কথায় বলে জলের সহিত দুধ মিশিয়ে হাঁসকে খেতে দিলে হাঁস সেই জলমিশ্রিত দুধ থেকে সার পদার্থটুকু খেয়ে নেবে। সারী কাঠ বলতে আমরা বুঝি কাঠের যে অংশ পেকেছে ভাল এবং যা দিয়ে আমাদের দরজা বা জানালা তৈরী করলে অনেকদিন চলবে বা পোকা লাগবে না। এই সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করে' দেখলে বোঝা যায় সার অর্থ আসল। আমরা যখন জমিতে সার দেওয়ার কথা বলি তখন এই অর্থ টি এর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। মাটিতে যে সার দেওয়া হয় সে সার বলতে আমরা এমন কতকগুলি জিনিষকে বুঝি যা মাটিতে দিলে মাটির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ও গাছও ভাল জন্মায়। সুতরাং এই সারের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে গাছকে সতেজ, সবল ও নীরোগ হয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

কিন্তু গাছের খাদ্য কি? গাছ ফটোসিনথিসিস করে' খাদ্য প্রস্তুত করে। বাতাস থেকে টেনে আনে কার্বনডায়অক্সাইড বাষ্প আর মাটি থেকে শিকড় দিয়ে টেনে নিয়ে আসে জল। এই জল ও কার্বনডায়-অক্সাইড সহযোগে গাছ প্রধানতঃ তার খাদ্য তৈরী করে পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ছিদ্রে—সূর্য্যের আলোর সহযোগে। আমাদের যেমন খাদ্য প্রস্তুত করতে আগুনের প্রয়োজন গাছের তেমনি সূর্য্যের আলো। আলো ব্যতিরেকে ফটোসিনথিসিস হয় না।

এই দুইটি ভিন্ন গাছের খাদ্যের জন্য প্রয়োজন হয় নানা রাসায়নিক পদার্থ। তার মধ্যে প্রধান নাইট্রোজেন। এভিন্ন আরও নানা রকমের রাসায়নিক দ্রব্য গাছের প্রয়োজন হয় তার বিশেষ বিশেষ অংশ বৃদ্ধির জন্য। মাটিতে গাছের বৃদ্ধির জন্য আমরা যে সার দিই সেই সার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটিকে বলা যায় জৈব সার অন্যটিকে বলা যায় অজৈব বা রাসায়নিক সার।

ইংরাজীতে দুটি শব্দ প্রচলিত আছে। Manure ও Fertiliser অনেক দেশে বলে manurial trial—সার গবেষণা আর আমেরিকায় বলে Fertiliser experiment অর্থ একই। Fertiliser ও Manure সম অর্থবাচক, কিন্তু আজকাল দুটি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। Manure বলতে এখন আমরা বুঝি জৈব সার। আর Fertiliser বলতে বুঝি রাসায়নিক সার। এরসঙ্গে পরীক্ষা কথাটি যখন যুক্ত থাকে তখন অবশ্য এদের অর্থের কোন তফাৎ থাকে না। কিন্তু যখন এরা একাকী ব্যবহৃত হয় তখন এদের দুটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ রীতি হয়ে গেছে।

আমাদের দেশের কৃষক পরিবারের প্রত্যেকে গরু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পুষে থাকেন। অন্যান্য পরিবারেও গরু পোষা হয়। গরু ভিন্ন আমাদের দেশের একরকম চাষ বন্ধ, যন্ত্র যুগে ট্রাক্টরের আমদানী হলেও আজও আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ভাগ চাষ হয় বলদ দিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত চাযের জন্য গরুর আর প্রয়োজন হবে না কিন্তু সেদিন এখনও ভারতে সুদূরে। কারণ আমেরিকার মত উন্নত দেশে আজও প্রায় শতকরা ২০ভাগ কৃষি হয় ঘোড়া দিয়ে। গরুর চেয়ে ঘোড়া বেশী কষ্টসহিষ্ণু তাই

প্রথম আমল থেকে সে দেশে ঘোড়া চলতি হয়, তারা আজ দীর্ঘ ৩০০ বৎসর ধরে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেও সারা দেশে ট্রাকটর দিয়ে চাষের সুবিধা করে দিতে পারে নি।

গরু প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু যে কারণেই গৃহে পালিত হউক না কেন পরোক্ষভাবে কৃষককে মাঠে সার দিতে সহায়তা করে। লেগুমিনাস জাতীয় ফসল মাটির উৎপাদন বাড়ায় ও অন্যান্য উপায়ে মাটির উৎপাদিকা শক্তি যতই বেশী করা যাকনা কেন—গরুর গোবর থেকে যে সার হয় তার মূল্য অনেক বেশী।

মাটির সব সময়ই ক্ষয় হচ্ছে। একদিকে যেমন ক্ষয় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি ক্ষয় পূরণের চেষ্টা চলছে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষয় পূরণের পরিমাণ ক্ষয়ের পরিমাণ থেকে অনেক কম যার ফলে মাটি দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ছে। মাঠে শস্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মাঠ থেকে সার জাতীয় পদার্থ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে। যদি কোন মাঠে গাছ বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য না থাকে তবে পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পাবে এর ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেই সার জাতীয় পদার্থ গাছের দেহের মাধ্যমে মাটি থেকে অপসারিত হবে। পরবৎসর যখন সেই মাঠে কৃষক ফসল ফলাতে যাবে তখন আর আশানুরূপ ফসল পাবে না। কারণ নৈসর্গিক উপায়ে মাটির যতটা ক্ষয় হয়, তার তুলনায়, ক্ষয়পূরণ হয় অনেক কম। এর জন্যই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে সার দিয়ে এই ক্ষয় পূরণ করা। বৎসরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাটির যে ক্ষয় সাধন ও ক্ষয় পূরণ হয় তার পরিমাণ জেনে নিয়ে মাটিতে উপযুক্ত পরিমানে সার দিলে প্রয়োজনমত ক্ষয় পূরণ হতে পারে।

মাটিকে সজীব বলা যায় না। কারণ সজীবতার সব লক্ষণগুলি মাটিতে নেই। কিন্তু মাটিতে সর্ব্বদাই ক্ষয়সাধন হচ্ছে। এই ক্ষয় হয়

দুইটি পথে প্রথমটী গাছের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্য্যয়ে। গাছ মাঠ থেকে রাসায়নিক পদার্থ টেনে নিয়ে সতেজ ও সবুজ হয়, এর ফলে মাটিতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায় আর মাটিতে বৃষ্টিপাত, কৃত্রিম জলসেচন ইত্যাদির ফলে মাটি থেকে বা মাঠ থেকে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি চলে যায়। অনেক সময় কেবল মাত্র লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় গাছ সেগুলি সংগ্রহ করে কেবল মাত্র মাটি থেকে। গাছ সোজাসুজি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না বা নাইট্রোজেন যখন বাষ্প আকারে থাকে তখন গাছ তাহা গ্রহণ করতে পারে না। গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে। আর এই নাইট্রেট প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয় নানাবিধ ধাতব পদার্থ। সেগুলি আসে মাটি থেকে। এই নাইট্রেট ও অন্যান্য কতকগুলি সহজ দ্রবনীয় মিশ্রপদার্থ জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে যায়। কেবলমাত্র রাসায়নিক সার দিয়ে সেগুলি পূরণ করা যায় না। জলের সহযোগে মাটি থেকে ক্যালসিয়াম অপসারণের পরিমাণ, মাঠ থেকে ফসলের মাধ্যমে অপসারিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণের চেয়েও বেশী। কিন্তু ফসফরাস সার জলের সঙ্গে মিশে খুব কমই চলে যায়। কারণ সুপারফসফেট জাতীয় সার অনায়াসে জলের সহিত দ্রবণীয় হয় না। কিন্তু বৃষ্টির ধারা যখন মাটিকে স্থানচ্যুত করে তখন অল্প পরিমাণে এই জাতীয় পদার্থ মাটি থেকে চলে যেতে পারে। পটাস জাতীয় সার মাটি থেকে এভাবে চলে' যায় সত্য কিন্তু এর বেশী ভাগ নষ্ট হয় দুধ ও পশমের মধ্য দিয়ে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে মাটির যত্ন না নেওয়া যায় তবে এই জাতীয় সার জলের সহিত মিশে বা অন্য কোন পন্থায় যেমন বৃষ্টির ধারার আঘাতে মাঠ থেকে চলে যেতে পারে।

মাটি ঠিক ব্যাঙ্কের মত। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা গচ্ছিত রাখা যাবে সেই অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে। জমা দেওয়া পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্ক কখনই দেবে না। মাটিও সেই রকম ব্যাঙ্ক। মাটিতে যতটা পরিমাণ সার আছে গাছ তার গ্রহণ যোগ্য অংশই গ্রহণ করতে পারে। প্রতি বৎসর গাছ মাটি থেকে তার গ্রহণোপযোগী খাদ্য শস্যকণা ও গাছের দেহের মাধ্যমে মাটি থেকে তুলে আনছে। এ ছাড়া বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ খাদ্য জাতীয় পদার্থগুলি কিছু পরিমাণে মাটি থেকে চলে যায়। তার ফলে মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহ বা প্রপিতামহ মাঠ থেকে যে পরিমানে ফসল পেতেন আজ আমরা আর সে পরিমাণে ফসল পাইনা। ফসল কম পাওয়ার প্রধান ও প্রথম কারণ মাঠে সার জাতীয় পদার্থ কমে যাওয়া। এরই ফলে মাটি অবধি ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হয়ে পড়ছে। সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হয়ত মাটি হবে না যদি উপযুক্ত পরিমাণে মৃত্তিকা সংরক্ষণ হয় কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাবে।

এই ফসলের কিছু অংশ যখন আমাদের গৃহপালিত পশুরা ভক্ষণ করে তখন এই ফসলের মধ্যে যে সমস্ত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাস ইত্যাদি থাকে সেগুলি এরই মধ্য দিয়ে জীবের দেহেতে প্রবেশ করে ও ঐগুলির দ্বারা জীবদেহের পরিপুষ্টি সাধন হয়। 'হলষ্টীন' এক-জাতীয় গরু। এই পশুটিকে দিয়ে পরীক্ষা করে' দেখা গেছে যে যদি একটী গরু ৩৭।৷০ পাউণ্ড দুধ দেয় তবে তাহাতে যে পরিমাণ নাট্রোজেন ফসফরাস ইত্যাদি থাকে তাহা ঘাস ইত্যাদির দ্বারা যে পরিমাণ খাদ্য পশুর দেহতে যায় তার পরিমাণের থেকে বেশী।

পশুদেহের প্রতিটী অংশ থেকে আমরা সার পেতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র মূত্র ও গোবর থেকে সার প্রস্তুত হয়। তা বাদে এদের মৃত্যুর

পর এদের হাড় থেকে হাড্ডিসার পাওয়া যেতে পারে। বহু পুরাতন কাল থেকে গোমুত্র ও গোময় সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। গোমূত্র গোময়, গোয়াল ঘরের খড়কুটা এবং এদের আধ খাওয়া খড়ের অংশ পচে খুব ভাল সার সৃষ্টি হয়। এরা যখন জলে পচে তখন কেবলমাত্র গোমূত্রটুকু জলের সহিত মিশে মাটি থেকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে গাছেরা বেড়ে ওঠে। সেই গাছ বা ঘাস যখন কোন পশু খায় তখন এদের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থগুলি পশুদেহেতে ঢোকে। তাই যখন কোন একটী পশুকে বিক্রয় করা হয় তখন তার দেহের মাধ্যমে ঘাস থেকে তুলে নিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটি থেকে যেমন চলে' যায় তেমনি তাদের মলমূত্রাদির দ্বারা যে সার প্রস্তুতির সম্ভাবনা ছিল সেটা দূর হয়। পশু গোয়াল থেকে বিক্রী করে দিলে ক্ষতি নিশ্চয়ই হয় কিন্তু তার থেকেও বেশী ক্ষতি হয় চাষীর তাদের মলমূত্রের অভাবে।

মলমূত্র ও খড়কুটা ভালভাবে সংরক্ষণ না করলে বিশেষ ক্ষতি হয়। (১) মলমূত্রাদি তরলীভূত হয়ে মাটির নীচে চলে যায়। (২) ইহাতে যে সমস্ত সহজে দ্রবণীয় দ্রব্য থাকে সেগুলিও চুইয়া যায়। (৩) আর এতে যে এমোনিয়া থাকে সেটিও নানাপ্রকার বীজাণুর ক্রিয়ার মাধ্যমে মাঠ থেকে চলে যেতে পারে। যদি গোমূত্র কোন বাঁধা জায়গায় আটকিয়ে রাখা না যায় তবে কোন ছিদ্র বিহীন পাত্রে রাখাই বাঞ্চনীয়। নইলে সেই স্তূপ থেকে এমোনিয়া উবে যেতে পারে। এ ভিন্ন এর মধ্যে যে সমস্ত বীজাণু ক্রিয়া সংঘটিত হয় তার দ্বারাও কিছু নাইট্রোজেন উবে যায়। খড়কুটা, গোময়, গোমূত্র ও আহার্য্য দ্রব্যের অধিকাংশ এর মধ্যে যে সমস্ত মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ থাকে সেগুলি এই বীজাণু ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক সময় জলের সহিত দ্রবণীয় হইয়া পড়ে।

জৈবসার

জৈবসার প্রস্তুত করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন যথেষ্ট উত্তাপ। এরই ফলে বীজাণুর বংশবৃদ্ধি হয় ও মাটিতে বিভিন্ন ক্রিয়া চলে। সব সময় নজর রাখতে হবে যেন উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে না পড়ে। বাইরের উত্তাপ থেকেও ভিতরে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া চলে তার ফলেও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ফলে দেখা যায় গোবরের স্তূপ থেকে ধোঁয়ার আকারে বাষ্প উবে যাচ্ছে। ইহাতে সার পদার্থের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদির গোবরের স্তূপে এগুলি বেশীরকম দেখা যায়। এর হাত এড়ান যায় যদি সমস্ত স্তূপে কোন ফাঁক না থাকে ও উযুক্তভাবে ভিজে রাখা যায়।

গোময় ও গোমুত্র রক্ষণবিধি

কৃষকের বাসস্থান থেকে যতটা দূরে এদেরকে রক্ষা করা যায় গৃহস্থের দিক থেকে ততই ভাল। স্থান নির্ব্বাচনের পর সেই স্থানে গর্ত্ত খুঁড়তে হয়। গর্ত্তের কোন বিশেষ পরিমাণ দেওয়া যায় না তবে গরু ইত্যাদির সংখ্যার উপর এর পরিমাণ নির্ভর করে। অবশ্য গর্ত্ত বেশী বড় করাও উচিত নয়। কারণ অনেক সময় লাঠি দিয়ে এইগুলি নেড়ে চেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গর্ত্তের আকার বড় হলে কাজের বিশেষ অসুবিধা হয়। গর্ত্তের গভীরতা ৬´ ফিটের বেশী করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সব থেকে ভাল হয় যদি এই খাদের তলা ও পাশ পাকা ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া যায়। তা হলে মুত্রাদি চুঁইয়ে যাবার আর ভয় থাকে না। আমেরিকায় ও নিউজিলণ্ডে যে যেখানে গরু ইত্যাদি পশু রাখা হয়

সেখানে রাতের বেলার জন্য খড়, ঘাস বা শস্য জাতীয় গাছের ডাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতে গরুর মুত্রাদি একটুও নষ্ট হয় না। খড়ের বা ঘাসের সহিত মিশে যায় পরে যখন ঐগুলি গর্ত্তে ফেলে দেওয়া হয় তখন মলমূত্রাদি এর সহিত গর্ত্তে চলে যাবে ও পচবে। এগুলি খাদে ফেলবার পূর্ব্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যে খাদের উপর যথেষ্ট ছায়া করবার ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ খাদ ঢাকা না থাকলে সূর্য্যের কিরণে জলকণা দূরীভূত হবে। আরও লক্ষ্য করতে হবে যেন উপর থেকে এই জল না পড়ে বা পাশের থেকে জল এসে ধুইয়ে না নিয়ে যায়। এর উপর দিয়ে যদি জলের স্রোত চলে যায় তবে এতে যে দ্রবণীয় পদার্থগুলি থাকবে তারা জলের সহিত মিশে খাদ থেকে বার হয়ে যাবে। সুতরাং খাদের উপরে কাঠ দিয়া অন্ততঃ সব দিক ঘিরে দেওয়া উচিত। খাদ তৈরীর পর তাহাতে পশুর মলমূত্রাদি ও খড়কুটা ইহাতে ফেললে ও মাঝে মাঝে নেড়ে দিলে ভাল আবর্জ্জনা সার প্রস্তুত হবে। পার্শ্বগুলি এমনভাবে তৈরী হবে যেন বাতাস চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত থাকে। মাঝে মঝে কিছু জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

এর ফলে কিছু নাইট্রোজেনের ক্ষতি হয়ে থাকে কিন্তু তার পরিমাণ অতি অল্প। সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় যদি বিভিন্ন পশুর বিষ্টা একই স্থানে পচান যায়। যদি কোন স্তূপের উত্তাপ খুব বেশী হয়ে যায় তবে একটু বেশী পদার্থ মাঝে মাঝে নেড়ে দেওয়া ও জল দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

সাধারণতঃ গোয়াল থেকে গোমূত্র ও অন্যান্য পশুর মূত্রাদি রক্ষা করবার ব্যবস্থা থাকে না। তার ফলে মূত্রাদি তরল পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষতঃ যে সমস্ত মেঝে পাকা সেখানটা জল দিয়ে ধুয়ে দিলে সমস্ত মূত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়। সব থেকে ভাল হয় যদি এই গোয়াল

ধোওয়া জল পাকা ড্রেনের মধ্য দিয়ে কমপোষ্ট স্তূপে আনা যায়। তা হলে স্তূপে আর জলের প্রয়োজন হবে না। অধিকন্তু এমোনিয়ার ভাগ বেড়ে যাবে। এই ভাবে মূত্রাদি রক্ষা করা যায়। তা বাদে খড় কুটার মিশ্রনেও কাজ হয়। সব থেকে ভাল হয় যদি মূত্রাদি ছিদ্র বিহীন ঢাকা পাত্রে জমা করা যায় এবং মশা মাছির সংস্পর্শে না আসে। এদের পচতে ৪।৬ মাস সময় লাগে।

যখন এই সার মাঠে যোগ করা যায় তখন নাইট্রোজেন এমোনিয়া হয়ে উবে যায়। খুব বৃষ্টির সময় মাটিতে সার দিলে মাঠ থেকে সার চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ যে জমিতে কিছু ঢাল আছে সেখানে এভাবে সার নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার এই সার মাটির সহিত মিশে গেলে সে ভয় আর থাকে না। তখন জলের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে এমোনিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঐ এমোনিয়া মাটির সহিত মিশে যেতে পারে। কিম্বা অন্য কোন ধাতব পদার্থের সহযোগে নাইট্রেট সৃষ্টি করতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেন এমোনিয়া আকারে থাকে ততক্ষণ জলের সহিত মিশে ও বাষ্পীয় ভবন হয়ে নষ্ট হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এদের নষ্ট হয় না। মাটিতে প্রচুর উত্তাপ থাকলে তাড়াতাড়ি এমোনিয়া থেকে নাইট্রেট উৎপত্তি হয়। এবং গাছ যদি তাড়াতাড়ি এই নাইট্রেট না নিতে পারে তবে তাহা জলের সহিত মিশে' চুইয়ে যাবে। ফলে গাছের নাইট্রোজেন জাতীয় সারের অভাব হয়।

আবর্জ্জনা সার বা কমপোষ্ট সার বা জৈব সার তৈরী করতে গিয়ে আমাদের ভালভাবে মনে রাখতে হবে যেন নাইট্রোজেন স্তূপ থেকে না চলে' যায়। অনেক সময় অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থও যোগ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই আবর্জ্জনা স্তূপে ক্যালসিয়াম সালফেট, জিপ-

সাম, সুপার ফসফেট, মনোক্যালসিয়াম ফসফেট এই স্তূপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় যে ভাবে আবর্জ্জনা সার তৈরী করতে হবে সেই অনুযায়ী ছুটী বা তিনটী রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ক্যালসিয়াম এমোনিয়ার সহিত ক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত করে। এবং ইহাতে যার ফলে দুর্গন্ধ না হয় তার চেষ্টা করে। এই আবর্জ্জনা সারে ফসফরাস খুবই কম থাকে। তার ফলে এই আবর্জ্জনা সারেতে অন্যান্য সব সারগুলি থাকলেও কেবলমাত্র এই সারটির অভাবে অনেক সময় মাঠে ভাল ফসল হয় না। মাটিতে ফসফরাস সার না ছড়িয়ে যদি এই কমপোষ্টের মধ্যে পরিমাণ মত ফসফেট সার দেওয়া যায় তবে ভাল ফসল পাওয়া যাবে। অনেক সময় মশা মাছি ইত্যাদি প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে পরিমাণ মত বোরিক এসিড ছড়িয়ে তাতে ভাল ফল পাওয়া গেছে। প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে সার তৈরী করতে গিয়ে চূণের গোলা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কমপোষ্ট সার (বিষ্ঠাদি)

বৃক্ষলতা গুল্মাদি পচে যে সার তৈরী হয় তাকে বলা যায় উদ্ভিজ্জ সার বা কমপোষ্ট সার। কিন্তু কমপোষ্ট সার বলতে আজকাল সহরের আবর্জ্জনা ও পায়খানার ময়লা পচিয়ে যে সার তৈরী করা হয় তাকে কমপোষ্ট সার বলে। নানা প্রকারের বীজাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "ফাঙ্গাস" জাতীয় উদ্ভিদ এই পচন ক্রিয়ার সাহায্য করে।

পৃথিবীর নানা দেশে এর ব্যবহার চলে আসছে অতি পুরাতন কাল থেকে। চীন দেশে আজ থেকে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে এর প্রচলন

দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুব পুরাতন নয়। যারা ধাপার কপি সম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁরা জানেন শীতকালের কপি উৎপাদনে এই সার খুব বেশী আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন আজকাল নানা রকম ফসলের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের একটা গোঁড়ামি ছিল পায়খানার ময়লা বলে সেটা আজকাল আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

ধান ও যবের ক্ষেতে যে সমস্ত খড় ও গোয়াল ঘরে যে সমস্ত সার পাওয়া যায় সেগুলি কমপোষ্ট তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে ৬০ ভাগ সেলুলোজ ও আধা সেলুলোজ দিয়ে এই জাতীয় পদার্থগুলির সৃষ্টি। এই সেলুলোজগুলি প্রভূত নাই-ট্রোজেন ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের সংযোগে পচে যায়। কিন্তু লিগনিনএ যে নাইট্রোজেন থাকে তা খুব সত্বর পচে না। কিন্তু লতা গুল্মাদিতে যে সমস্ত অতি সহজ পচ্য পদার্থ আছে সেগুলি সত্বর মাটিতে পচতে থাকে ও সমস্ত প্রোটিন এক জায়গায় জমা হয়। বৃক্ষ-লতাদি পচে যে সার তৈরী হয় সেগুলি এই পচা সেলুলোজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সেলুলোজগুলি অতি সহজে নাইট্রোজেন উৎপন্নকারী বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ফাঙ্গাস জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য জলীয় বীজাণু। প্রথমেই এই বীজাণু খড়ের বা লতাপাতার উপর একটা অতি সূক্ষ্ম সেলের দ্বারা আবৃত করে ফেলে। এরই ফলে বৃক্ষের লতাপাতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ কঠিন জাতীয় পদার্থে পচন ক্রিয়া সুরু হয়। এই কঠিন জাতীয় পদার্থকে অন্য যৌগিক পদার্থে পরিবর্তিত করতে গেলে বহুপরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জাতীয় সারের প্রয়োজন হয়। কারণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস দিয়ে ক্ষুদ্র নলের মধ্যে প্রোটিন সৃষ্টি হয়, যেহেতু সেলুলোজের পচন ক্রিয়ার

উপর কার্বন জাতীয় পদার্থের স্থষ্টি নির্ভর করে। সেই হেতু সেলুলো-জের পরিমাণের উপর নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ভর করে।

যে সমস্ত বৃক্ষ, লতাগুল্মাদির দ্বারা উদ্ভিজ্জ সার বা কমপোষ্ট সার তৈরী হয় তাহাতে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে না। সেই কারণে কিছু রাসায়নিক নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এর ফলে সেই কমপোষ্ট সারে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ও সেলুলোজের পরিমাণ কমে যায়।

কমপোষ্ট স্থষ্টিতে অতি আবশ্যকীয় পদার্থ

(১) বৃক্ষ, লতাগুল্মাদি জাতীয় পদার্থ ধান, যব, গম্, জোয়ার ইত্যাদির খড়। নানা প্রকারের আগাছা, গাছের পাতা, তামাক, সরিষা, রেড়ি ও কার্পাস গাছের ডাঁটা, চায়ের পাতা, কলাগাছের পাতার অংশ, কচুরীপানা ও অন্যান্য পচা দ্রব্যাদি।

(২) প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন, যে পরিমাণে উদ্ভিজ্জ জাতীয় পদার্থ ও মলমূত্রাদি দেওয়া হয় ঠিক তার অর্দ্ধেক পরিমাণ জলের প্রয়োজন। জল বেশী হলে বীজাণু স্থষ্টিতে বাধা পড়ে। উষ্ণ মণ্ডলে খুব তাড়াতাড়ি জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে যায়। স্থতরাং কিছু বেশী জলের প্রয়োজন হয়।

(৩) এই খাদে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য কয়েকটী বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রয়োজন হয় যেমন গরুর গোবর ও মলমুত্রাদি কিম্বা ক্যালসিয়াম সিয়ানোমাইড বা এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ।

সাধারণতঃ যব, গম ও ধানের খড়ে শতকরা ০·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। পচন ক্রিয়ার সুবিধার জন্য আরও ০ ৭ ভাগ নাট্রোজেন যোগ করা উচিত। মলমুত্রাদিতে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে সুতরাং আর রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয় না। লতাপাতা ইত্যাদিতে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে না। সব থেকে ভাল হয় খড় পাতা-লতা ও ঘাসের সংমিশ্রণে আবর্জ্জনা জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া কারণ এগুলি শুকনা অবস্থার কোন কাজের হয় না।

যাহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয় তার জন্য প্রয়োজন বায়ুর। সে জন্য যতদূর সম্ভব উলটিয়ে পালটিয়ে দিতে হয়।

রাসায়নিক পদার্থ যোগ করবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে কি কি পদার্থ সেই গাথার মধ্যে দেওয়া আছে। যদি কোন খাদের মধ্যে কেবলমাত্র আবর্জ্জনা ফেলা হয় তবে সেখানে রাসায়নিক পদার্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যেখানে রাসায়নিক পদার্থের দেওয়ার প্রয়োজন নাই যেমন মলমুত্র ইত্যাদিতে রাসায়নিক সার দিলে পরে কঠিন জাতীয় পদার্থের হ্রাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সময় নাইট্রোজেনও হ্রাস পায়।

কমপোষ্ট প্রস্তুত পদ্ধতি

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির প্রচলন আছে। যখন গত মহাযুদ্ধে জাপানের রাসায়নিক সার কম পড়ে গেল তখন সেখানকার মাটিতে কেবল মাত্র কমপোষ্ট সার ঢালা হয়েছিল। এর আগে বলেছি চীন দেশে কমপোষ্ট সার মাঠে দেওয়ার রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে।

সাধারণ ভাবে ৪০″ উচ্চ স্তূপ তৈরী করা হয়। খড়, লতাপাতা, আখের ছিবড়া আনুমানিক ৪০″ উচ্চ করে রাখা হয়। এতে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়ে তার উপর ১০″।১২″ চওড়া পাৎলা একটী মলমূত্রের স্তর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সারে যদি পরিমাণ মত ফসফরাস জাতীয় সার (সুপারফসফেট) এই স্তূপের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে খুব ভাল হয়। এ পর্য্যন্ত করবার পর টেবিলের ছাদের মত সমান হবে তবে পাশের দিকে ঢালু হবে ঢিবির মত।

এইবার ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয় আর যেন সূর্য্যের উত্তাপে এগুলি শুকায়ে না যায়। এক মাসের মধ্যে এই স্তূপে আর হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এক মাস পরে এগুলি একটু উলটিয়ে দিলে ভাল হয়। এতে এই স্তূপের সকল অংশে সমান ভাবে পচন ক্রিয়ার সুবিধা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গর্ত খুড়বার নীতি হলো—৬মি × ২মিঃ × ২মি (১মিঃ = ৩৯,৩৭ ইঞ্চি) এই দেশে মাঝে মাঝে এই আবর্জ্জনা-স্তূপে চুণ দিবার রীতি আছে। বড় জাতীয় গাছে কমপোষ্ট সার ২ মাসের মধ্যে তৈরী হয়। কিন্তু মাঠের ব্যবহার উপযোগী সার তৈরী করতে অন্ততঃ ৪ মাস সময় লাগে। রাশিয়ায় স্তূপের উপর যে ঢাকনি দেওয়া থাকে সেটা মাসে একবার করে বদলিয়ে দেওয়া হয় আর গোবর জাতীয় অংশের সহিত কিছু ফসফেট দেওয়া হয়।

ADCO পদ্ধতি

একটি বৃটিশ কোম্পানী এই জিনিষটীর প্রচলন করেছেন। এর কার্য্যকারিতা ও পচনক্রিয়ার গতি নির্ভর করে ADCO পাওডার স্তূপে

ছড়ানোর পরিমাণের উপর। ঠিক কি দিয়ে ADCO পাউডার তৈরী জানা যায়নি—কারণ এটা হলো তাদের ব্যবসায়িক গোপনতা। তবে দেখা যায় যে এর মধ্যে আছে এমোনিয়াম সালফেট, সিয়ানামাইড ও ইউরিয়া। এই তিন প্রকার পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে ১২" একটী খড়ের স্তর স্থাপন করা হয়। পরে উপযুক্ত পরিমাণ জল সঞ্চালন করে, উপযুক্ত পরিমাণে ADCO পাউডার যোগ করা হয়। এই রকম উপর্য্যুপরি ৬টী স্তর স্থাপন করা ভাল। ১ টন শুষ্ক উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে দেড় হন্দর ADCO পাউডার যোগ করা উচিত। ১৫´×৬´×৬´ খাদের আয়তন।

যখন মাঠের কাজ কৃষকের শেষ হয়ে' যায় তখন চাষী যত আবর্জ্জনা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে সেগুলি সংগ্রহ করে, খড়, কাঠ, লতাগুল্ম, আগাছা ও ঘাস এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রাখে। অবসর সময়ে বড় বড় লতা কাঠ, খড় ইত্যাদি মোট করে টুকরা করে। তার পর সেগুলিকে ভাল করে মিশিয়ে ৬´×৪´×২´ আয়ত ক্ষেত্রে স্থাপন করে।

আনুমানিক ২ মণ কাঁচা গোবর নিয়ে সমপরিমাণ জলের সহিত মিশিয়ে নেওয়া হয়। তার পর ঐ মিশ্রিত গোবর জল ঐ স্তূপের উপর ঢেলে দেওয়া হয় ও স্তূপটিকে ভিজিয়ে রাখে। যত দিন না স্তূপের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় তত দিন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হ'বে। উত্তাপ বাড়বার কয়েক দিন পরেই উষ্ণতা কমে যায়, এই পদ্ধতিতে দেখা যায় যে গোচোনা বিশেষ উপকারী কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে এই গোচোনা পাওয়া যায় না। এটা শেষ হলে নূতন একটী স্তূপ আরম্ভ করা উচিত।

ডাঃ আচার্য্য একটী নূতন পদ্ধতির চলন করেন। সাধারণতঃ

ভারতবর্ষে আবর্জ্জনা ও মলমূত্র দিয়ে কমপোষ্ট তৈরী করা হয়। উপযুক্ত পরিমাণ খাদের মাঝখানে গাড়ী যেতে পারে এমন জায়গা রাখা হয়। অন্ততঃ প্রয়োজন মত লম্বালম্বি তৈরী করা হয়।

লোকসংখ্যা—

১০,০০০ হাজারের কম	২০´×৬´×৩´
১০,০০০ থেকে ২০,০০০	২৫´×৭´×৪´

খাদের আয়তন যত মোটা থাকবে ততই ভাল। গ্রামে খানা প্রস্তুত করে প্রথমে নীচের অংশে ৯´।১০´´ পরিমিত স্থানে সহরের আবর্জ্জনা খড় কুটা ইত্যাদি দিতে হয়। ইহার উপরে ৩´ পুরু করে মলমূত্রাদি ঢেলে দিতে হয়। এর উপর আবার ১০´ আবর্জ্জনা সার দিয়ে পরে আবার মলমূত্রাদি। এমনি করে তিনটী স্তর হবে। (১ কিউবিক ফিট আবর্জ্জনার ওজন ২০ পাউণ্ড। ২০´÷৫´×৯/৪= ১৮০০ পাঃ আনুমানিক ১ মেঃ টন) ১ কিঃ মিট মলমূত্র=৬২.৫ পাঃ। ২৯´×৬´×৯/৪=১৮৭৫ পা আনুমানিক ১ মেঃ টন।

সমস্ত মাল মসলা ঢালা হয়ে গেলে ঘাসের চাঁপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। যদি ৫।৭ দিনের মধ্যে কোন খানা ভর্ত্তি না হয় তবে ভাল ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, কারণ—

(১) ইহা মাছির হাত থেকে মলমূত্রকে রক্ষা করবে।

(২) এমন ভাবে সংরক্ষিত হবে যাতে জল দূষিত না হয়।

(৩) মলমূত্রাদি খাদে ফেলবার আগে রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে পাথোজিনিক বীজাণু নষ্ট করতে হয়,

মশা ও মাছির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঢেকে রাখাই ভাল। যে সমস্ত মলমূত্রাদি রক্ষিত হবে সেগুলি ঢেকে রাখা উচিত। যদি

ডিম্ব ও অন্যান্য বীজাণু মাটির নীচে ও ঘাসের বীজ থাকে তবে তারা নষ্ট হয়ে যায়। এই বীজাণু সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। যদি এই অবস্থায় মাঠে দিতে হয় তবে মাঠে ফসল বাড়ার থেকে কমে যাবে ও মাটির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে মাটির নীচে খাদ করলে, জলে ডুবে যাবে। জলের সহায়তায় বহু রাসায়নিক পদার্থ স্তূপ হতে বার হয়ে যাবে। সে জন্য ভূমির উপর বাঁধ দিয়ে, মাটির বা ইঁটের খাদ করা উচিত। তবে যেখানে মাঝারি রকমের বৃষ্টি হয় ও ভূনিম্নস্থ জলের স্তর নীচে থাকে সেখানে মাটির নীচে খাদ করলে কোন বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। মাটির উপরে স্তূপ করলে লাভ হয়।

কমপোষ্টের উপকারিতা

(১) সাধারণতঃ মাটির বৈশিষ্ট্যের উন্নতি করে। বালুময় জমিতে দিলে এক একটি বালুকণার সহিত অন্য বালুকণায় বাঁধন তৈরী করে, আবার কাদা মাটিতে দিলে ঘন সন্নিবিষ্ট একটি কাদামাটির কণাকে অন্যের কাছ থেকে বাঁধন ছিঁড়ে টেনে আনে।

(২) কমপোষ্টের মধ্যে জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। তার ফলে এই সার মাঠে দিলে মাটির এই কার্বণ জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি পায়। এ ভিন্ন অন্য রাসায়নিক পদার্থ বৃদ্ধি পাবে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাস ও ক্যালসিয়াম। ইহা ছাড়া বৃক্ষাদির কোন অংশ যখন মাটিতে পড়ে তখন সেখানে কার্বনডায়অক্সাইড বাষ্প (CO_2) তৈরী হয় এবং জলের সহিত মিশে H_2CO_3 তৈরী করে। এর

ফলে গাছের খাদ্য গ্রহণের সুবিধা হয়। (৩) যখন এই সার মাটিতে দেওয়া হয় তখন মাঠে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হয়। মাটিতে এই বীজাণুর বৃদ্ধির ফলে ও মাটিতে ফাঙ্গাস জাতীয় অতি ক্ষুদ্র জাতীয় গাছের বৃদ্ধির জন্য মাটির ফসল বাড়ানোর ক্ষমতা বাড়ে।

মানুষের মলমূত্রাদি

মানুষের মলমূত্র দিয়ে সার তৈরী করার রীতি আজ আর নূতন নয়। আজ থেকে ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে মানুষের পরিত্যক্ত বিষ্ঠা থেকে সার তৈরী পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিরাট চীন দেশ অসংখ্য যেখানে লোক। এইভাবে দেশের শতকরা ১০ ভাগ সারের চাহিদা মেটে। জাপানেও এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৪৫ সালে যত সার জাপানের মাঠে দেওয়া হয়েছিল তার শতকরা ১১ ১ ভাগ এসেছিল এই মানুষের মলমূত্রাদি থেকে, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে এর বিশেষ প্রচলন ছিল না। কারণ এ সম্বন্ধে মানুষের অস্পৃশ্যতা এর জন্য দায়ী। আজকাল কৃষকের সে মনোভাব চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের দেশের বহু কৃষক আর মাঠে এই সার ছড়াতে গররাজি নয়। কারণ তারা দেখেছে এ দিয়ে তারা মাঠ থেকে ভাল ফসল পেতে পারে।

চীন দেশে দুইটী বিশেষ অঞ্চলে যেখানে ধান ও গম উৎপাদন হয় দুটী অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানে অবশ্য মানুষের মল-মূত্রাদির সহিত অন্যান্য পশুর মলমূত্রাদি মিশিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের মলের সহিত অন্যান্য পশুর মল মিশিয়ে ঘুঁটের আকারে ৭।৮ দিন শুকিয়ে নিয়ে অনেক সময় তার গুঁড়া করে নিয়ে মাঠেতে ছড়ান। এর মধ্যে

থাকে শতকরা ৯ ভাগ জলীয় পদার্থ, ৫৭ ভাগ ছাই ১।৭ ভাগ নাইট্রোজেন ১।৯ ভাগ অন্যান্য রাসায়নিক অম্ল পদার্থ ও ১৯ ভাগ জৈব সার বা কার্বণ জাতীয় পদার্থ, কেবলমাত্র পশুদের বিষ্ঠা থেকে এই পরিমাণ সার পাওয়া যায়, কারণ মূত্রাদি তরল পদার্থ রক্ষণের কোন ব্যবস্থা সেখানে-নেই। কিন্তু দক্ষিণ চীনে এই তরল ও শক্ত উভয় জাতীয় পদার্থ থেকে সার তৈরী হয়। কোন খাদের মধ্যে এগুলিকে পচিয়ে নিয়ে কৃষক এগুলিকে মাঠে ছড়ায়। অনেক সময় এর সঙ্গে খড় কুটা ইত্যাদি মিশিয়ে নেয়। এতে খুব সুন্দর কমপোষ্ট সার তৈরী হয়।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে এদের সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ সেখানে কোন বিশেষ স্থানে কেহ মলমূত্রাদি ত্যাগ করে না। অথচ আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোকেরও বেশী পল্লী অঞ্চলে বাস করে। কিন্তু সহরে ও সহরতলীতে একটু চেষ্টা করলেই এগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে সেখানে কোন লোহার কড়া, বালতি বা গামলা বসিয়ে রেখে এগুলি সংগ্রহ করা হয়। পরে প্রত্যহ সকালে সেগুলি কোন একটী গাড়ীর সাহায্যে বড় পাত্র দিয়ে যেখানে খাদ করা থাকে সেখানে এনে ঢেলে দেওয়া হয়। ৩।৫ সপ্তাহ মাটি চাপা দিয়ে রাখলে কমপোষ্ট তৈরী হয়ে যায়। অবশ্য মাঠে দিবার মত হতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগে।

মাটিতে কখনই কাঁচা অবস্থায় এই সার দেওয়া উচিত নয়। তাতে উপকার থেকে অপকারই বেশী হবে। আর এই মলমূত্রাদি জল ঢেলে খুব তরল করে নিতে হয়, নতুবা কোন খাদে এগুলি সরিয়ে নিলে ভাল হয়। অন্ততঃ তিন মাস ধরে পচান উচিত। স্বাস্থ্য রক্ষার দিক থেকে ৪ মাস মাটির তলায় রাখলে ভাল হয়। কারণ এর মধ্যে যে সমস্ত বায়ু দূষিত কারক বীজাণু থাকে সেগুলি এই সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে

যেতে পারে। তা বাদে টাটকা মলমূত্র মাঠে জমা করলে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

জাপানী কৃষকেরা মাঠেতে এই সার জমা করবার আগে কোন খাদের মধ্যে এগুলি পুতে রাখে। আবার অনেক সময় এর সঙ্গে কেহ আবার সালফেট যোগ করে নেয়। অনেক সময় অনেক যত্ন করে এদের রক্ষণাবেক্ষণ করলেও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন এর থেকে নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য নাইট্রোজেন ও কার্বন জাতীয় সার ভিন্ন অন্য গুলি অতি সহজে নষ্ট হয় না। প্রথমে মিশ্র নাইট্রোজেন পদার্থ-গুলি বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিয়ার ফলে মলমূত্রাদি হতে পড়ে এমনিয়ার সৃষ্টি করে। পরে সেখান থেকে এমোনিয়াম কার্বনেট এবং শেষে নাইট্রেট তৈরী হয়। বেশী দিন বায়ুতে এ স্তূপ থেকে নাইট্রোজেন অর্দ্ধেক চলে যায়। চীন দেশে এর পরীক্ষা হয়েছে। চীনারা দেখিয়েছেন যে ১২ সপ্তাহ স্তূপ করে রাখলে শতকরা ৫০ ভাগ নাইট্রেজেন কমে যাবে আর ভাল ভাবে রাখলে ১৬ সপ্তাহে ১৬ অংশ কমে যাবে। মলমূত্রাদিতে থাকে—

নাইট্রোজেন—০.৫১%
পটাস— ০.২৩%
ফসফরাস— ০.১০%
কার্বন জাতীয় পদার্থ ১.৪% থেকে ১.৭%।

এই মলমূত্রাদির থেকে সার তৈরী করে চীনারা দেশের মাটীর ফসল বাড়িয়েছে ফলে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে একথা নিশ্চিত, কিন্তু একপক্ষে দেশের ক্ষতি করেছেন। চীন দেশে মৃত্যুর হার খুব বেশী। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই মলমূত্রাদি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে তারা দেশে উৎকট ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়েছেন এবং তারই ফলে চীন দেশে

মৃত্যুর হার এত বেশী। তা বাদে চীনাদের শারীরিক অবনতির মূল কারণ এইটী বলে অনেকে মনে করেন। এই মানুষের মলমূত্রের সাহায্যে দেশে কলেরা, টাইফয়েড ও প্যারা-টাইফয়েড ও এমোবিক আমাশা প্রভৃতি বহু দুরারোগ্য রোগ দেশের একাংশ থেকে অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এ দিক থেকে এই মলমূত্রাদি থেকে তৈরী কমপোষ্ট সার মাঠে দেওয়ার থেকে রাসায়নিক সার মাঠে দেওয়া খুব ভাল। তবে বিশেষ ভাবে পচিয়ে মাঠে ঢাল্‌লে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

মনে রাখতে হবে—

(১) যেখানে এই মলমূত্রাদি পচিয়ে জৈব সার বা আবর্জ্জনা সার তৈরী করতে হবে সেটা যেন লোকালয় থেকে বেশ দূরে হয় ও সেখানে মশা মাছি না থাকে।

(২) এমন ভাবে পচাতে হবে যাতে পচানোর ফলে জল ও বায়ু দূষিত না হয়।

(৩) এই মলমূত্রাদি খাদে বা রক্ষণাগারে ঢালবার পূর্বে এর মধ্যে যে সমস্ত রোগের বীজ ও বীজাণুর ডিম থাকে বা অন্য প্রোটোজোয়া থাকে সেগুলি নষ্ট করে ফেলতে হবে।

আজকাল দিকে দিকে সারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সহরে ও সহরতলীতে গাড়ীতে করে মলমূত্রাদি বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। মাছের আঁশ, কাঁটা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা কম ক্ষতিকর। তবুও সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে এরা যেন জনস্বাস্থ্য দূষিত না করে ফেলে এবং যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। মাটির নীচে এগুলি রাখলে প্রোটাজোয়া প্রভৃতি বীজাণু নষ্ট হয়ে যায়।

৩

নগরের আবর্জনা ও মলমূত্রাদি

মানুষের ও পশুর মলমূত্রাদি ও সহরের যে সমস্ত অন্য আবর্জ্জনা জমে সেগুলিকে কি ভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা সহরের নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণীর জল যাতে দূষিত না করতে পারে ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি না হয় এর জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং সহরের পৌর-বিভাগ ও প্রতিটি দেশের সরকার এ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এই যে সহরের ময়লা এর মধ্যে পাওয়া যায় না এমন জিনিষই নেই। কারণ মানুষের ব্যবহৃত অব্যবহৃত প্রায় লক্ষাধিক দ্রব্য পচে এর সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সকল রকমের পচানি সার বিদ্যমান থাকে। তার মধ্যে কার্বণ জাতীয় পদার্থ ও লতাগুল্ম পচানি সার বেশী। এই দুইটী বিভিন্ন পচানি সার তৈরী করতে দুইটী বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রধান লক্ষ্য হবে মানুষের কোন স্বাস্থ্যহানি না করে অতি অল্প দামে এই সার কৃষকের মাঠে পৌছিয়ে দেওয়া।

কলিকাতার মত বড় সহরে মানুষের মলমূত্রাদি জলের সহিত মিশিয়ে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে এর মধ্যে যে ঈষৎ শক্ত পদার্থ থাকে সেগুলি জলের সহিত মিশে যায়। কারণ এর শতকরা ৯৯ ভাগই জল। এর মধ্যে যে সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ থাকে সেগুলি এই ময়লা পদার্থ হতে বাইরে আসে এর পরে আবার জলের সহিত মিশে যায়। কোন সমুদ্রের বা নদীর জলের সহিত মিশে যাবার আগে এর সাথে প্রচুর ক্লোরিণ মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

যে সমস্ত শক্ত অদ্রবণীয় পদার্থ জলের সহিত বাহির হয়ে আসে

সেগুলিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ছাঁকিয়া লইলে (Screening) করে নিলে যাহা পাওয়া যায় সেগুলিকে পুড়িয়ে বা মাটির তলে পুতে এর থেকে সার প্রস্তুত হয়। এর মধ্যে যে গুলি খুব শক্ত কণা সেগুলিকে নিয়ে সালাজ তৈরী হয় 'Slup। এতেও কিছু জল থাকে। সেগুলিকে আরও শুকিয়ে নিয়ে একেবারে জলবিহীন করা হয়। পরে গুঁড়া করে দেওয়া হয়। ভিজা স্লাজকে অনেক সময় সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে সার হিসাবে মাঠে ছড়ানোর আগে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া উচিত।

এতে ভাল কাজ হয় না। কারণ এতে যে নাইট্রোজেন থাকে তার শতকরা ৫০ভাগ থাকে তরল পদার্থের সহিত মিশে। ফসফরাস ৫০ থাকে জলের সহিত মিশে, আর যে পটাস থাকে তার প্রায় সবটাই থাকে জলের সহিত মিশে। সুতরাং কোন প্রকার জলে চলে গেলে মাঠ থেকে এই সার গুলিও চলে যায়। সেইজন্য অনেক দেশে এই জল দিয়ে মাটিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করেন। এর প্রধান অসুবিধা বড় বড় আকারের কৃষিক্ষেত্রগুলি সহরের নিকটে থাকে না। ফলে দূরে এই সহরের ময়লা জল টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়। যে কারণেই হউক যদি এ ময়লা জল পাওয়া যায় তবে এটা কৃষি ক্ষেত্রের নিকটে হওয়া উচিত। জার্ম্মানীতে শুধু বর্ত্তমান কালে নয় আজ থেকে ১০০০ বৎসর আগেও মাঠে এই ভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। কৃষিক্ষেত্রগুলি সহরের থেকে বেশী দূরে হলে মাঠেতে এই স্লাজ নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, কারণ পথে যেতে বহু স্লাজ নষ্ট হয়ে যায়। যেখান দিয়ে যাবে সেখানকার জলন্ত বাতাস দুষিত করে ফেলবে। তাই প্যারিস ও বার্লিনের নিকটে যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র আছে তাদের মাঠের ফলন বেশী। কারণ সেখানে এই স্লাজ দিয়ে সার দেওয়া হয়। কেবলমাত্র প্যারিস সহরের নিকটে ১৯৩৬

সালে ১,৫০,৮০০ একর জমিতে ও বার্লিনের নিকটে ২৮,০০০ একর জমিতে এইভাবে চাষ করা হয়েছিল।

যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, আবহাওয়া উষ্ণ যেখানকার মাটি বালুময় সেখানে এই দিয়ে জল সেচনের কাজ করলে মাটিতে কেবলমাত্র জলের বৃদ্ধি হয় না তাঁর সঙ্গে অন্য যে সমস্ত ধাতব ও কার্বণ জাতীয় সার থাকে, সেগুলি এই মৃত্তিকা কণার ফাঁকে স্থাপিত হয়ে বন্ধন রজ্জু সৃষ্টি করে। এতে যেমন এগুলি গাছের সহজ লভ্য হয় গাছও বাড়ে তেমনি পরোক্ষভাবে মাটিরও উন্নতি বিধান করে। যদিও এই জলেতে প্রচুর পরিমাণে পটাস ও ফসফরাস 'জাতীয় সার থাকে তবুও সেটা গাছের গ্রহণ যোগ্য হয় না। কারণ জলের সহিত চুঁইয়ে কিছু পরিমাণ সার মাটির নিম্নস্তরে চলে যায়। এইভাবে মাঠেতে জলসেচন ও সার দিতে গেলে মাটির দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ বালুকাময় মাটি ভিন্ন অন্য কোন মাটিতে এই জাতীয় সার দিলে জল সহজে নীচে চুইয়ে যেতে পারবে না এবং ফলে একটি অপ্রবেশ্য স্তরের সৃষ্টি করবে।

আফ্রিকার জোহান্সবার্গের নিকটে কয়েকটি কৃষিক্ষেত্র আছে কেবল-মাত্র এইভাবে সেখানে চাষ করা হয়। এই ভাবে সার দেওয়া ও জলসেচনের মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে যে বালুকণা সহ মাটিতে ঐ তলানি সার দুই বালুকণার মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে মাটিতে এই ভাবে সার ও জলসেচন করে মাঠের মাটির উন্নতি হয়েছে এবং মাঠে ঘাস জন্মেছে অসম্ভব পরিমাণে। এখানে অন্য কৃষককে গরু চরাণোর জন্য মাথাপিছু দৈনিক ৩ পেনি দিতে হয়।

সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সহরের এই জাতীয় ময়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১) জলসেচনের ব্যবস্থার সহিত এই ময়লা জল মাঠেতে কেবলমাত্র

যখন ঘাসের চাষ হয় তখন দিয়ে দেওয়া হয়, গরমকালে আমাদের দেশে ঘাসের অভাব হয়। তখন যদি কোন ঘাসের খেতে এই জল দেওয়া যায় তবে ঘাসের খুব ভাল বাড় হবে। কারণ এই সময়ে ১৮দিন অন্তর মাটি ভিজিয়ে দিতে পারলে খেতের পক্ষে খুবই ভাল হয়। একবার জল সেচন করতে ৩ দিন ৫দিন লাগবে জল শুকাতে। তার পর ১২দিন পশুতে সব মাঠে ঘাস খাবে। এভাবে ভাল ফল পাওয়া গেছে। শীতের দিনে এর ব্যবস্থা না করাই উচিত।

(২) শহরের ময়লাজলকে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। এতে একটু তলানি পড়ে যাবে। তারপর ঐ জল খেতের মধ্যে চালিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) সমস্ত ময়লা জমা করা। জোরালো স্লাজ তৈরী করবার জন্য তলানি বসিয়ে নেওয়া হয় ও জলটিকে কোথাও জমা করে রাখা হয়। তারপর সময় মত সেখান থেকে সব জল মাঠের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়।

এদিয়ে মাঠের প্রচুর উন্নতি হয় ও মাঠেতে প্রচুর সার যোগ হয়। নিম্নে একটি চার্ট দেওয়া গেল—

	জলসেচনের আগে	জলসেচনের পরে	
	১৯১২	১৯২৪	১৯৩৮
নাইট্রোজেন	০·১৩	০·২৬	০·৫
ফসফরিক এসিড	০·০৫	০ ১৭	০·২৫
পটাস	০·১৫	০·৮০	১·৮০
চন	০০'৬	০·৩২	৯·৩৯

সহরের এই ময়লা থেকে আরও অন্য রকমের শ্লাজ তৈরী করা যেতে পারে। (১) কেবলমাত্র তলানি সারের কণা গুলি একটু আকারে বড়। নইলে যেগুলি জলের সহিত মিশে থাকে সেগুলি অতি ক্ষুদ্র। (২) ঐ তলানি সার কয়েকদিন কোন বায়ুহীন স্থানে রেখে দিলে যে বীজাণু প্রক্রিয়া ঘটে তাতে এই শ্লাজের উন্নতি হয়। (৩) এই ময়লা জলে তবুও বহু পরিমাণে কাদা ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এবং তাদের তলানি পড়বার গতি খুব কম হওয়ায় (Settling velocity) এদের তলানি পড়তে বহুদিন লাগে। এইজন্য এক জায়গায় এটাকে বদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। তারপর যখন, দেখা যায় যে জলটা প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে তখন তলানি পড়া জিনিষ, জল বার করে দিয়ে, তুলে নিয়ে বেশ ভাল করে শুকান হয়। শুকালে পর একে গুঁড়া করে নেওয়া হয়। এগুলিকে বলা হয় (Activated sludge) (৪) শ্লাজের এই অংশে কিছু জল দিয়ে আবার বীজাণু ক্রিয়া করা হয় একে বলে (Digest activated sludge).

লেগুমিনাস জাতীয় গাছের নডুলগুলি (মাটির নীচের ফোলা অংশগুলি) মাটির উপরের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাটিতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সৃষ্টি করে। গাছ, যতদূর জানা গেছে এই রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে বেড়ে উঠে। মাটিতে যে ঘাস জন্মায় সেই ঘাস খায় আমাদের দেশে যত গৃহপালিত পশু। প্রাণী দেহেতে বিভিন্ন গঠন ও ভাঙ্গন ক্রিয়ার (Anabolism and catabolism) মধ্য দিয়ে গাছের দেহ থেকে নাইট্রোজেন বা অন্যান্য দ্রব্যগুলি প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অংশে মিশে যায় ও নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করে, শরীরের উন্নতি সাধন করে। আবার নানা প্রকার জৈবিক ধর্ম্মের মাধ্যমে এগুলি দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। গোবরের মধ্যে থাকে শতকরা ৭৫%

নাইট্রোজেন ৬০% ফসফরাস ও প্রায় শতকরা ৮০% পটাস। এই প্রাণীদের মলমূত্রাদি থেকে বেশী পরিমাণে ঘাসের খাদ্য জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এমন কি মাটি থেকে যে সমস্ত অপ্রধান ধাতুগুলি যেমন "বোরণ মালিবডিনাম, ক্লোরিণ ইত্যাদি থাকে সেগুলিও মলমূত্রের সহিত বাহিরে" আসে আবার শাক সব্জী বা কোন গাছের মধ্য দিয়ে জীবদেহে প্রবেশ করে। আবর্জ্জনা সারের স্তূপে কিছু পরিমাণ ফসফরাস যোগ করে এবং মাটির অম্লতা (acidity) বৃদ্ধি পেলে পরিমিত চুণ ছড়িয়ে দিয়ে যদি উপযুক্ত রোটেশানে মাঠে ফসলোৎপাদন করা হয় তবে অন্য কোন রাসায়নিক সার না দিয়েও মাঠের উর্ব্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং ফসফরাসের বৃদ্ধি করা যায়। সমস্ত বিষয়টি নির্ভর করে আবর্জ্জনা সারের তৈরী করার পদ্ধতির উপর। সুপার ফসফেট মিশ্র সারে বিশেষ কাজ পাওয়া যায় কারণ সুপার ফসফেট কেবলমাত্র মাটিকে ফসফরাসই দেয় না বরং মাটিতে যদি বীজাণু প্রক্রিয়ায় এমোনিয়া সৃষ্টি করে তবে তাকে ধরে নিয়ে নূতন একটি মিশ্র পদার্থ তৈরী করতে সাহায্য করে।

আবর্জ্জনা সার মাঠে ছড়াবার সব থেকে ভাল সময় মাঠে বীজ ছড়াবার বা কোন গর্ত্তে চারা গাছ পুতবার অন্ততঃ ১৫দিন আগে। সব থেকে ভাল হয় যখন চাষের জন্য প্রথমবার মাটি খোঁড়া হয় ঠিক তার পরেই যদি এই সার মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় লাঙ্গল দেওয়া যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সার মাঠেতে ছড়াবার পরে যেন বৃষ্টিতে মাঠের সমস্ত সার না ধুয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে কৃষক প্রথম চাষ দিবার পরই মাঠেতে আবর্জ্জনা সার স্তূপ করে রেখে দিয়েছেন কিন্তু ছড়িয়ে দেননি। এতেও ফল খারাপ হয়, কারণ আবর্জ্জনা সারের জলকণা শুকিয়ে আসে। তার ফলে কতকগুলি বীজাণু অকর্ম্মণ্য হয়ে

পড়ে। আবর্জ্জনা সার মাঠেতে ছড়াবার পর অন্ততঃ ২বার লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে খেতে শস্য পরিবর্ত্তন করে ভাল ফল পেয়েছেন। আমাদের দেশেও এ কথা কৃষকদের কাছে অজানা নয়। অনেকেই জানেন পাটের পরে ধান ফসল ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে বহু সময় ইচ্ছা থাকলেও তারা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না। তাই তারা বছরের পর বছর ধানের ক্ষেতে ধান আর পাটের খেতে পাট করে চলেছেন।

আজ পৃথিবীর কোন চাষীই অস্বীকার করবেন না যে রোটেশান প্রথায় মাঠের ফসল বাড়ে না। কিন্তু এর থেকেও মাটীর ফসল বাড়ান যায় মাঠের উৎপাদিকা শক্তি না কমিয়ে (Animal form Agriculture) পশুপালন কৃষি পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে মাঠে সোয়াবীন, ভুট্টা গম ও ক্লোভার জাতীয় ফসল মাঠে উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে কেবল গমজাত ফসলের শস্যবীজ নানা কাজে ব্যবহার করা হয় নইলে অন্য সমস্ত ফসলগুলি গরু, ঘোড়া বা শূকর ইত্যাদিকে খাওয়ান হয় ও যত্নসহকারে আবর্জ্জনা সার তৈরী করা হয়। এই সার দিয়ে মাঠে যে ফসল পাওয়া যায় তার পরিমাণ রোটেশন পদ্ধিতে পাওয়া ফসল থেকে অনেক বেশী। অবশ্য মাটির অম্লতা নিবারণ ও সুপারফসফেট মাঠে উভয় কালেই পরিমাণ মত যোগ করা উচিত।

ঘাস, শস্য ও গাছের লতাপাতা পালিত পশুকে খাওয়ান হয় আর ডাঁটা খড়কুটা ইত্যাদি গোয়ালে পশুদের রাত্রিবাসের জন্য বিছিয়ে দিয়ে প্রতিদিন সকালে পশুদের মলমূত্রাদিসহ আবর্জ্জনাস্তুপে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে সার তৈরী করলে দেখা যায় যে এক একর জমিতে ৪ টন

সার .উৎপাদিত হয়। শুষ্ক পদার্থের থাকে অনুপাত থাকে ৩ঃ১.৫। একটী ১০০০ পাউণ্ড ওজনের পশুর কাছ থেকে দিনে ২৫ পাউণ্ড ওজনের মলমূত্রাদি পাওয়া যায়। অবশ্য সব সময়ে একটি পশুর কাছ থেকে ঐ পরিমাণে মলমূত্র পাওয়া যায় না। তা বাদে মুরগী, শূকর গরুর থেকে ওজনে অনেক কম। তাদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির যদি কোন গড় নেওয়া যায় তবে ঐ সংখ্যা কার্য্যকরী হয় না। তা বাদে পশুদেহে সুখ ও অসুখ আছে যার ফলে এদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির পরিমাণ কমবেশী হয়। দেখা যায় যে খড়কুটা ও মলমূত্রাদির ওজন আবর্জ্জনাস্তূপে আবর্জ্জনা সারে পরিণত হলে এদের অনুপাত ১ঃ১ ৪৯ মধ্যে থাকে। ১৩০০ পাউণ্ড ওজনের একটি হলষ্টীন গরুর কাছ থেকে ২১ টন কমপোষ্ট সার পাওয়া যেতে পারে এদের মলমূত্রের অনুপাত থাকে ৭৫ঃ২৫।

যে গরুর দেহ ভাল পুষ্ট নয় ও যাহার খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে এই সমস্ত পদার্থ থাকে না তাদের মলমূত্রেও এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ কম পরিমাণে থাকে আর এই মলমূত্র মাঠের নানা জাতীয় শস্যাদি ডাঁটা দিয়ে শতকরা ৮০ ভাগ পদার্থ আমরা পেতে পারি। ১ টন তূলা বীজে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহা ১৫০ পা সোডিয়াম নাইট্রেট এ যে পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে তার থেকেও বেশী আর এই বীজের মধ্যে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তার পরিমাণ ১শত পাঃ সুপার ফসফেটে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তাহার সমান। এ ভিন্ন এই তুলা বীজে অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম, ম্যাগেনেসিয়াম ও সালফার থাকে। কিন্তু যতক্ষণ এই সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি কোন বীজের মধ্যে থাকে বা পচা বীজে থাকে ততক্ষণ কোন গাছ এইগুলি টানতে পারে না। কিন্তু একবার কোন জীব দেহে ঢুকে তার মলমূত্রের সহিত যদি বাইরে আসে তখন তাহা অনায়াসে গাছ টেনে নিতে পারে।

কোন খেতে যদি নাইট্রোজেন বেশী পরিমাণে থাকে তবে সেই খেতের ফসল সেই মাটি থেকে বেশী নাইট্রোজেন টানবে, পুনরায় ঐ গাছের দেহের মাধ্যমে অন্য প্রাণীর দেহে যেতে পারে। খেতে বা তার ফসলে যদি নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে তবে সেই খেতে সতর্কতার সহিত আবাদ করতে হয়। কারণ একটু অসাবধান হলে বা ভালরূপে খেতে তদারক না করলে মাঠের নাইট্রোজেন স্তুপ থেকে আগে নাইট্রোজেন চলে যাবে।

আমাদের দেশে অনেক কৃষক আছে যারা পশুপালন করতে পারে না। যদিও বা পশুপালন করে তবুও অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার ও অসাবধানতার জন্য অনেক সময় নিজেদের কুঁড়েমির জন্যওবা, এই মূল্যবান আবর্জ্জনা সার তৈরী করতে পারে না। পৃথিবীর অন্য সব দেশে, এমনকি ইউরোপ রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে কোন কৃষকই কৃত্রিম আবর্জ্জনা সার তৈরী করতে ক্ষান্ত হয় না। চীন দেশের সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আমাদের দেশের গরুর যে গোবর পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগ আমরা ব্যবহার করি জ্বালানি বস্তু হিসাবে। এর ফলে সারের দিক থেকে বিশেষ ক্ষতি হয়। এ ভিন্ন মাঠে চরবার সময় গরু যে সমস্ত মলমূত্র পরিত্যাগ করে সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অজৈব সার দিতে কৃষকের উদাসীনতা থাকতে পারে কিন্তু জৈব সার দিয়ে তো মাঠের কোন ক্ষতি হয় না। তবুও এই মূল্যবান সার সংগ্রহের জন্য আমরা একটু ও ইচ্ছা প্রকাশ করি না।

সবুজ সার।

কেবলমাত্র জলেতে রাসায়নিক সার যোগ করে গাছ তৈরী করবার পদ্ধতি বার হবার পর দেখা গেছে যে মাটি থেকে গাছ কঠিন জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে না। কেবল মাত্র বালু-রাশিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে এই পরীক্ষার ফল আরও দৃঢ় করা হয়েছে। এ দিয়ে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সোজাসুজি গাছ মাটি থেকে কার্বণ জাতীয় বা জৈব পদার্থ গ্রহণ করে না। যদিও গাছ প্রত্যক্ষ ভাবে এই জিনিষটী মাটি থেকে গ্রহণ করে না তবুও দেখা যায় যে এই জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয় পদার্থ মাটিতে থেকে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ায়। এবং গাছ যাতে পরোক্ষ ভাবে সতেজ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য মাটিকে সহায্য করে।

গাছের সবুজ অংশ মাটিতে চাপা দিলে উত্তাপ ও জলের প্রভাবে সেই সবুজ অংশে পচন ক্রিয়া সুরু হয়। এই পচন ক্রিয়া শুরু হয় নানা ক্ষুদ্র, বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে। প্রধানতঃ তিনটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই পচনক্রিয়া সুরু হয় এবং এই পচনের ফলে গাছের সবুজ অংশের প্রোটিন থেকে নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে। পরে ঐ রিক্ত নাইট্রোজেন আবার মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে মিশ্র নাইট্রেট তৈরী করে এবং ইহা গাছের গ্রহণ যোগ্য হয়।

(১) উত্তাপ—লতাপাতা পচনের জন্য প্রথম প্রয়োজন উত্তাপ। অনেক সময় উত্তাপ বেশী পেলে পচন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় না বরং লতাপাতা শুকিয়ে যায়। উত্তাপের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে যে সীমারেখায় গাছের লতাপাতা বেশী পচে এবং যার থেকে বেশী উত্তাপ দিলে পচন বেশী হয় না। উষ্ণ মণ্ডলে ৩৫ সেঃ পচন খুব বেশী হয়—নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে ২৫° সেঃ।

(২) উপযুক্ত পরিমাণে জলের প্রয়োজন। জল ব্যতিরেকে গাছ কিছুতেই পচতে পারে না। গাছের যে অংশ মাটির নীচে দেওয়া যাবে সে অংশ জলছিপে শুকিয়ে যাবে। তার ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে লিগনিন বেরিয়ে আসবে এবং মিশ্র নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করবে। জলেরও একটা পরিমাণ আছে। মাটির জল ধারণ ক্ষমতার অংশ জলে ভর্ত্তি থাকলে ভাল কাজ হয়। (৩) আলো ও বাতাস। মাটির নীচে এই পচন ক্রিয়াকে সাহায্য করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে। অক্সিজেন ব্যতিরেকে পচন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না;

মাটির নীচে যত বীজাণুর সৃষ্টি হয় তারা সব একশ্রেণীর নয়। এদের এক একটি শ্রেণী গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে এক একটি খাদ্য গ্রহণ করে। এদের এক শ্রেণী গাছেতে যে প্রোটিন থাকে তার থেকে নাইট্রোজেন বার করে এনে এমোনিয়া তৈরী করে। পরে এর থেকে নাইট্রেট সৃষ্টি হয় ও গাছ তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই জৈব পদার্থ বা কার্ব্বণ জাতীয় পদার্থ গাছকে মাটিতে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। যত রকমের বীজাণু নিয়ে আজ ভেষজ গবেষণাগারে কাজ হয় তার প্রায় প্রতিটিকে মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য একই অবস্থায় একই সময়ে সবাইকে পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু বৎসরান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে এদের দেখা যায়।

ভারতের চাষীদের কাছে মাঠে সবুজ সার দেওয়া যে নূতন একথা নিশ্চয় করে বলা চলে না তবে তাদের কাছে এটাকে নূতন করে বৈজ্ঞানিক প্রথার মাধ্যমে চালু করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের সবুজ সার ব্যবহার করার রীতি আছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ধইঞ্চা, সানাই ও নীল প্রভৃতি গাছগুলি মাটির সহিত মিশিয়ে

দিয়ে মাটিতে সার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। মহীশূর অঞ্চলে বীন দিয়ে চাষ করা হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা একটু বেশী সে সব স্থানে একটু ঝোপ জাতীয় গাছের চাষ করা উচিত। বোম্বাই অঞ্চলে যে অঞ্চলে ধান হয়, সেখানে ধইঞ্চা দিয়ে সবুজ সার করার চেষ্টা চলছে। বারানসী, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম অঞ্চলে ধইঞ্চা দিয়ে সবুজ সার তৈরীর চেষ্টা চলছে। সানহেম্প গাছ বেশী বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ধন্‌চা গাছ ৫।৭ ফিট জলের তলায় ১৫ দিনও জীবিত থাকতে পারে।

সবুজ সারকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) লেগু-মিনাস জাতীয় গাছ যাদের মাটির মধ্যে শিকড় এর কোন কোন অংশ স্ফীত হয়ে থাকে। (২) যারা লেগুমিনাস জাতীয় নয়। লেগুমিনাস জাতীয় বহু গাছ আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ধন্‌চা, সানাই, সীম ও বারসীম বেশ চলতি আছে। কারণ আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার পক্ষে এই গাছগুলি খুবই উপকারী। এই লেগুমিনাস জাতীয় গাছ দিয়ে সবুজ সার করার বিশেষ পার্থক্য হলো যে এদের শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে। এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে এবং শিকড়ে জমা করে রাখে। সুতরাং যখন এই গাছগুলিকে মাটির তলায় পচিয়ে নেওয়া হয় তখন তাদের দেহের সাথে সাথে এই নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির সাথে মিশে যায়। অন্য জাতীয় গাছে এভাবে মাঠেতে সার বৃদ্ধির চেষ্টা করে না। সুতরাং যদি মাঠে সবুজ সার দিতে হয় তবে কোন লেগুমিনাস জাতীয় গাছ মাঠেতে ফসল ফলান উচিৎ।

ভারতে আজ যে সমস্ত সবুজ সার প্রচলিত হয়েছে তার মধ্যে সানাই সব থেকে ভাল। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টিতে মাঠে এই

বীজ ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে এরা পরিপূর্ণতা পায়। অতি অনুর্ব্বর মাটিতেও এরা ভাল ভাবে জন্মায়। এক একর জমিতে ২১ মণ সবুজ অংশ ও ৪১ সের নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করতে পারে। এর পরেই ধন্চা। এক একর জমিতে ২০০ মণ সবুজ সার করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য কোনটি দিয়ে ৩১ সেরের বেশী N_2 যোগ করা যায় না।

মসুর—একরে	৫০ মণ	সবুজ অংশ	১৬সের নাইট্রোজেন
বারসীম ,,	১৫৫ ,, ,,	,,	২৭ ” ,,
খেঁসারি ,,	১২৩ ,, ,,	,,	২৭ ,, ,,

সবুজসার ও ফসলোৎপাদন।

আমাদের দেশের পরীক্ষাগারে ও চাষীর জমিতে সবুজ সার পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জাতীয় সার দিয়ে মাটি থেকে বেশী ফসল পাওয়া যায়। আমাদের দেশ উষ্ণ অঞ্চলে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। প্রখর উত্তাপে মাটির উপরে যে কার্ব্বনজাতীয় পদার্থ থাকে সেগুলি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ভারতের দক্ষিণের প্রায় এই সব জমিতে কার্ব্বন জাতীয় পদার্থ খুব কম। এই পদার্থের কম পড়বার আর একটী কারণ আছে। মাঠেতে নাইট্রোজেন কম হওয়ার সাথে কার্ব্বন জাতীয় পদার্থও কমে যায়। ফলে সেখানে বেশী বীজাণু ক্রিয়া হতে পারে না। ফলে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না।

সবুজ সার তৈরী করতে গিয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন গাছের ডাঁটা শক্ত না হয়। কারণ ডাঁটা শক্ত হয়ে গেলে মাটির সহিত সহজে ও শীঘ্র মিশবে না। আধ পচা হয়ে মাটির তলে পড়ে থাকবে ও কতকগুলি বীজাণু সহযোগে এমন একটী পরিবেশ সৃষ্টি করবে তাতে

গাছের শিকড়ের তার মধ্যে ঢোকা একরকম অসম্ভব। এতে গাছের ক্ষতি হয়। সেকারণে ঠিক একটু কাঁচা থাকতেই গাছগুলিকে মাটির তলে দিয়ে দেওয়া উচিত।

জানা ও অজানার মাঝে আমরা মাঠেতে সবুজ সার দিয়ে থাকি। আমাদের দেশের মাঠ থেকে যখন ধান গাছগুলি কেটে ফেলা হয় তখন মাঠেতে ধানের গোড়ার কতকাংশ রয়ে যায় এগুলি মাঠে জলে পচে ভাল সার তৈরী করে।

মাঠের উপরিভাগে গাছের পাতা ইত্যাদি পচে যে একটী কালো স্তরের সৃষ্টি করে তাকে বলে 'হিউমাস' এতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী। কার্ব্বন জাতীয় পদার্থ শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী থাকে। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় যে কয়েক বৎসরে এই কালো শুষ্ক পাতা মাটিতে পরিণত হয়েছে।

সবুজ সারের উপকারিতা কি ?

(১) গাছের ডাঁটা ও পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ইহাতে কার্ব্বন জাতীয় পদার্থ ভিন্ন নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড, পটাস ও ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য কার্ব্বন উপাদানগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকে। যখন মাটির সহিত গাছের পাতা ও ডাঁটা মিশে যায় তখন এই পচা সার মাধ্যমে এই জাতীয় পদার্থগুলি মাটিতে গিয়ে পড়ে। আর কিছুদিন মাটির সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি গাছের গ্রহণ যোগ্য হয়।

(২) গাছেরা কার্ব্বনডায় অক্সাইড বাষ্প ও অক্সিজেন বাতাস থেকে সংগ্রহ করে। সুতরাং গাছের শক্তিদায়ক বাষ্পীয় পদার্থ-

গুলি গাছের ডাঁটা ও পাতার মধ্য দিয়ে মাটিতে যায় এবং গাছে নূতন শক্তি দেয়।

(৩) যদি লেগুমিনাস জাতীয় গাছ হয় তবে তার শিকড়ের গাঁইট বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে (N_2) নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

(৪) যে সময় খেতে ফসল থাকে না সেই সময় খেতের মাটি গাছ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। কারণ তা হলে সূর্য্যের তেজ সোজাসুজি মাটিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে না। তা বাদে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা সোজাসুজি পড়ে মাটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। এইভাবে মাটির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৫) যে সমস্ত গাছের শিকড় মাটির নীচে চলে যায় বহুদূর তারা সেখান থেকে গাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে আনে।

(৬) সবুজ সারের জন্য তৈরী গাছগুলোকে মাটির নীচে দিয়ে দিলে গাছগুলো অনেক খাদ্যের সন্ধান পাবে এবং এই খাদ্য থেকে অনেক বীজাণু উৎপত্তি হবে।

(৭) গাছের পাতা ও দেহাবশিষ্ট দিয়ে যে হিউমাস সৃষ্টি করবে তার প্রভাবে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

(৮) এই কার্ব্বনজাতীয় পদার্থের প্রয়োগে মাটির গঠন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্ত্তন হয়। অতি সহজে মাটিকে গ্রানুলার ও কলমনার অবয়বে আনতে পারে।

(৯) সবুজ সার প্রয়োগে মাটির মধ্যে বাতাস চলাচলের সাহায্য করে।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সবুজ সারের প্রচলন হয়েছে। তুন্দ্রাঞ্চলে যেখানে জল জমে বরফ হয় সামান্য যদি এই সবুজ সার করে মাটিতে

মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে গাছ মাটির তলে থাকার ফলে জল জমতে অসুবিধা হয়। গ্রীষ্মকালে এই সবুজ সারের গাছগুলো মাটিকে অত্যধিক উত্তাপের হাত থেকে রক্ষা করে। যেখানে প্রচুর জল পাওয়া যায় সেখানে এই সবুজ সারের প্রচলন আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পীচ ও কমলালেবুর বাগানেও এই সবুজ সারের প্রচলন আছে।

সাধারণ লেগুমিনাস ও ননলেগুমিনাস উভয়জাতীয় গাছের দ্বারা সবুজ সার তৈরীর প্রচলন আছে। তবে ননলেগুমিনাস থেকে লেগুমিনাস চলনের প্রধান কারণ যে লেগুমিনাস মাঠেতে নাইট্রোজেন বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

পচন পদ্ধতি ও লেগুমিনাস জাতীয় গাছ।

(১) ক্লোভার—এই গাছ খুব বেশী বড় হয় না। ১ ফিট থেকে ৩ ফিটের মধ্যে। ডাঁটাগুলি নরম থাকে অনেকটা আমাদের দেশের কচুর ডাঁটার মত। মাটির নীচে দিয়ে দিলে খুব বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করতে পারে.। সব থেকে উৎকৃষ্ট সবুজ সার। শিকড়ের পরিমাণ খুব বেশী ও মাটির তলায় বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে—একরে ৪২ সের থেকে ৯২ সের পর্যন্ত নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে। ক্লোভার জাতীয় গাছের মধ্যে ল্যাডাইনোক্লোভার সব থেকে ভাল।

(২) লুসার্ণ বা এলফাএলকা—এই লেগুমিনাস জাতীয় গাছ মাঠে সব থেকে বেশী নাইট্রোজেন যোগ করে। একরে ৫০ সের থেকে ১০০ সের পর্যন্ত। এই গাছে খুব বেশী প্রোটীন থাকে। এইগুলি গরুকে খাওয়ালে গরুর দুধে বেশী প্রোটিন পাওয়া যায়।

(৩) কলাই জাতীয় গাছ (Cowpea)—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর প্রচলন বেশী। বৎসরের সবসময় এই জাতীয় গাছ খেতে বাড়তে পারে। বর্ষা সমাগমে এর পত্রভার বৃদ্ধি পায়। প্রধান শিকড়গুলি মাটির তলে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে মাটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। এ ছাড়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেনও টেনে আনে। সাধারণতঃ একরে ৮ পাউণ্ড বীজ ছড়ান হয়।

(৪) সোয়াবীন—কলাই-এর মত। তবে ঠিক উপযুক্ত সময়ে একে মাটির তলায় দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ গাছ পেকে গেলে ডাঁটা শক্ত হয়ে যায়। চারা বার হবার পর ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে এই গাছের ডাঁটায় ও পাতায় বেশী নাইট্রোজেন থাকে। যে অঞ্চলে কলাইএর বীজ পাওরা যায় না সেখানে এর প্রচলন আছে। একরে প্রায় ৩০ সের নাইট্রোজেন যোগ করে।

(৫) ধন্‌চা—বাংলা দেশে এর প্রচলন খুব বেশী। কারণ এ গাছ রোদ ও বৃষ্টি সমভাবে সহ্য করতে পারে। শুষ্ক মাটিতে বা লবণাক্ত মাটিতে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। জমিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মত জল থাকলেই এই গাছ সেখানে জন্মাবে। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে দুই মাসের মধ্যে কোন একটি বীজ থেকে চারা বার হয় নি। যদি এর পরে উপযুক্ত বৃষ্টি পায় তবে সেই বীজ থেকে চারা বার হবে। তা বাদে গরু, ছাগলে ধনচা গাছ বড় একটা নষ্ট করে না। বাংলা দেশের মেটে পথের ধারে বা মাঠেতে যেখানে সেখানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। একর প্রতি প্রায় ৫০ পাউণ্ড বীজের প্রয়োজন।

(৬) সানহেম্প (Saun Hemp) ভারতবর্ষে ধন্‌চা ও সানহেম্প প্রায় সমান পরিমাণে চলে। তবে ধন্‌চার মত এ গাছ জল সহ্য করতে পারে

না। তুইদিন কি তিন দিনের মধ্যে জলে পচে যায়। এর জন্য মাটির কোন বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। একরে ৫০ সের বীজের প্রয়োজন।

সবুজ সারের বীজ ও গাছ ঠিক করতে গিয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত যে সেই গাছের পাতার সংখ্যা কত। যে গাছের পাতা বড় নয় বা সংখ্যায় বেশী নয় সেই জাতটাকে দিয়ে বেশী কাজ হবে না। তা ছাড়া আরও লক্ষ্য রাখতে হবে গাছ কত তাড়াতাড়ি পূর্ণতা পায়। রেড়ির পাতা খুব বড়। এই কচি পাতা যদি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

অনেকে আমাদের দেশে ধন্‌চা ও আউষ ধান এক সময়ে মাঠে চাষ করেছেন। তাদের ধন্‌চা গাছ একটু বেড়ে উঠলে তাকে তুলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এতে যেমন মাঠের ফসল পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সবুজ সারও যোগ হয়। এ ভিন্ন অনেক সময় মাঠে রেড়ির পাতা দিয়ে সবুজ সার তৈরী করা হয়।

ফসল	সবুজ অংশ (পরিমাণ) একরে।	নাইট্রোজেন
লুসার্ণ	৬টন	১০০—২০০ পাঃ একর প্রতি
ল্যাডাইনো ক্লোভার	৫টন	১৫০—২০০ " "
কলাই	৬টন	৪-পাঃ " "
সোয়াবীন	৬টন	৬০পাঃ " "
ধন্‌চা	৮টন	৬৬পাঃ " "
সানহেম্প	১৫টন	[illegible]০পাঃ " "

নাইট্রোজেন

গাছ ও গাছের খাদ্য।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় গাছ বেড়ে উঠলেও গাছের সম্যক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রচুর আলো ও বাতাস। সূর্য্যের আলোকে গাছ খাদ্য তৈরী করে আর মাটির নীচে যে বাতাস থাকে সেগুলি শূন্য করে জল আটকে রাখে। প্রকৃতি সদয় হলে এর অভাব হয় না আর অসদয় হলে কোন গাছ সেখানে জন্মাতে পারে না। সূর্য্যের আলোর অভাবে ও তার উত্তাপের তারতম্য প্রভাবে মাটিতে সব সময় অক্সিজেন পদ্ধতি কাজ করে চলেছে। তার ফলে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক সার বা পদার্থ আছে সেগুলি গাছের গ্রহণীয় হয়ে পড়ে।

তিনটী জিনিষের মাধ্যমে গাছ খাদ্য আহরণ করে। বাতাস, জল আর মাটি। মাটি ও বায়ু উপাদান জোগায় আর জলের মাধ্যমে এরা পাতায় আসে। বায়ু থেকে গাছ সংগ্রহ করে কার্বনডায় অক্সাইড আর মাটি থেকে সংগ্রহ করে অন্যান্য খাদ্য। এগুলি গাছ জলের সঙ্গে শিকড় দিয়ে টেনে নিয়ে আসে। মাটি থেকে জল নিয়ে আসার সাথে সাথে আরও কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থ টেনে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে ১২টী পদার্থ প্রধান যথা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লোহা ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে আবার নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস বিশেষ প্রয়োজন। এ বাদেও আরও রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা

মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তার মধ্যে কপার, মলিবডিনাম, জিঙ্ক, ইত্যাদি। কিন্তু মাটিতে এগুলি খুব কম পরিমাণ থাকে। ১,০০০,০০০ ভাগে.একভাগ কি দুই ভাগ আছে। অর্থাৎ এক একর জমিতে ১পাউণ্ড কি ২পাউণ্ড মাত্র। গাছের দেহ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে প্রায় ৬০টী রাসায়নিক মূল পদার্থ পাওয়া যায়। এর সবগুলিই আসে মাটি থেকে। তবে সব গাছে সব রাসায়নিক পদার্থ সমভাবে থাকে না তার উপর অনেক সময় হয়ত পাওয়াই যায় না।

মাটিতে সার জাতীয় পদার্থের ক্ষয় হয় দুরকমে। প্রথমতঃ বৃষ্টির ও উত্তাপের ফলে। দ্বিতীয়তঃ খেতের ফসলের মাধ্যমে। আগেই বলেছি উত্তাপের ফলে মাটিতে অক্সিডেশান চলছে। এই অক্সিডেশানের ফলে মাটিতে লিগনাটিক প্রোটিন বা প্রোটিন থেকে এমোনিয়া তৈরী হয়। এবং এর উপর বৃষ্টির জল পড়লে জলের সঙ্গে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন মাঠ থেকে চলে যায়। এ ভিন্ন আরও একটি কারণ থাকতে পারে যে এই সার জাতীয় পদার্থগুলি অগ্রহণীয় অবস্থায় থাকে। কারণ দেখা যায় কম বা বেশী গাছের তাপ বৃদ্ধির জন্য এইগুলিকে প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে কয়েকটী আছে অতি আবশ্যকীয় যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস—এই তিনটি। এই তিনটী মাত্র রাসায়নিক পদার্থ, মাঠে পরিমাণ মত ছড়ালে গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে। আর যে সমস্ত নূতন ধাতব পদার্থের কথা বলা হলো সেগুলি অতি অল্প পরিমাণে মাটিতে থাকে এবং সেগুলি মাঠেতে প্রায়ই প্রয়োজন মত পেয়ে থাকে। এই পদার্থগুলি মাঠেতে না থেকে মাঠের ফসল কমাতে পারে বা গাছ নানা রোগে রোগাক্রান্ত হয়।

পৃথিবীতে এমন খুব কম মাটি আছে যেখানে এই তিনটী মৌলিক

রাসায়নিক পদার্থ গাছের প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণীয় অবস্থায় আছে। কারণ মানুষ যে দিন থেকে চাষবাস সুরু করে মাঠে ফসল ফলাতে শিখেছে সেই দিন মাটি থেকে সার পদার্থ বেশী ক্ষয়ে যাচ্ছে। যদিও কয়েকটী নৈসর্গিক উপায়ে এই ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা ক্ষতির পরিমাণ পূরণের পরিমাণ থেকে সব সময়ই বেশী। "সয়েলব্যাঙ্ক" খালি হতে হতে আজ প্রায় শূন্য হতে চলেছে। ইংলণ্ডে রদামষ্টেড গবেষণাগারের নিকটে মাটিতে শতকরা ২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে আমাদের দেশে শতকরা ০.০৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে উল্লিখিত মাটিতে মাত্র শতকরা ৫ভাগ নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশের মাটীতে শতকরা ৫০ভাগের বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণীয় অবস্থায় থাকে। তার ফলে আমাদের মাটীতে খুব কম থাকলেও সাধারণতঃ কোন অভাব হয় না। কারণ এই নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বা এমোনিয়া নাইট্রোজেন টানতে পারে। খুব সম্ভবতঃ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট গাছ সহজেই মাটি থেকে টেনে নেয়।

গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন টানে আর এই নাইট্রোজেন মাটিতে কার্বনজাতীয় বা জৈব পদার্থের সহিত মিশে থাকে। অনেক সময় মাটিতে এই কার্বনজাতীয় পদার্থ বা কোন রাসায়নিক সার যোগ করলে মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই কার্বনজাতীয় পদার্থের সহিত মিশে গাছের গ্রহণযোগ্য পদার্থের সৃষ্টি করে। মাটিতে কার্বন-জাতীয় যে পদার্থ থাকে বা যদি কোন জৈব পদার্থ যোগ করা হয় তাতে নানাপ্রকার বীজাণু ক্রিয়া চলে। ফলে গাছের পাতায় ও দেহেতে যে প্রোটিন থাকে সেগুলি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়—অক্সিজেন সহকারে ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রোটিন—এমাইনো এসিড

—এমোনিয়া —নাইট্রাইট —নাইট্রেট-র সৃষ্টি করে। সামান্য পরিমাণ জল ও উত্তাপের সহযোগে মাটীতে প্রোটিন সহজেই এমোনিয়া তৈরী করে। মাটিতে যদি চাষ দেওয়া থাকে তবে এই অল্পতে অতি সহজেই নাইট্রেট তৈরী হয়। মাটী অম্লপূর্ণ হলে বা মাটিতে অম্লতার ভাগ বেশী হলে নাইট্রেট তৈরী হতে পারে না। গাছের শিকড় যখন মাটীতে চলতে চলতে এমোনিয়ার সন্ধান পায় তখন গাছ মাটি থেকে অনেক সময় এমোনিয়া ও শিকড় দিয়ে টেনে নেয়। মাটি থেকে গাছ এইভাবে দুইটী পদার্থ থেকে অজৈব নাইট্রোজেন টেনে নেয়, ফলে গাছের আর জৈব নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় না বা টেনে নিলে ও তার পরিমাণ খুব কম

মাটিতে জৈব পদার্থের সহিত যে নাইট্রোজেন মিশে থাকে তার মধ্যে খুব কম হয়। কেবলমাত্র বিভিন্ন পর্য্যায়ে যখন রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে তখন কিছু পরিমাণে যে শক্তি (energy) সৃষ্টি করে সেটী নষ্ট হয়ে যায় ও জল সেচনের ফলে মাটি থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন নষ্ট হয়। এর সংরক্ষণ না করলে অনেক সময় কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন নষ্ট হয়ে যায়। বালু মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে না কারণ এই মাটিতে জৈব পদার্থ খুব কম। আবার কালো মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী কারণ ঐ মাটিতে কার্ব্বন জাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন সব সময়ই মাটিতে নিজেদের পরিমাণের একটী অনুপাত রক্ষা করে। ১০ঃ ১ থেকে ২০ঃ ১ মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ সকল মাটিতে এর পরিমাণ থাকে ১০ঃ ১। কেবল উষ্ণ অঞ্চলের মাটিতে এর একটু তারতম্য হয়ে থাকে। গাছের লতাপাতা পচে যে হিউমিক (humic) এসিডের সৃষ্টি করে তা মাটির নীচে চুঁইয়ে গেলেও মাটির উপরিস্তরে ০-৮″ মধ্যে-ই থাকে।

যে মাটিতে শতকরা ২ভাগ কার্বনজাতীয় পদার্থ আছে সে মাটিতে অন্ততঃ শতকরা ০.১০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। যদি এক একর জমিতে লাঙ্গলের ফলা যতদূর যেতে পারে সেই পরিমাণ মাটির ওজন ২,০০০০০০ পাউণ্ড হয় তবে সেই মাটিতে ৭০,০০০ পাউণ্ড জৈব পদার্থ আছে। আর ২,০০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আছে। যখন মাটিতে চাষ করা হয় তখন মাটিতে নানা প্রকার ক্রিয়ার মাধ্যমে এই নাইট্রোজেন জৈব পদার্থ থেকে নির্গত হয় ও গাছের গ্রহণোপযোগী মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে। এর জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন সূর্য্যের আলো। ডাঃ ধর দেখিয়েছেন উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে খোঁড়া মাঠে বেশী অক্সিডেশান হয়। তার ফলে গ্রীষ্মকালে মাঠে বেশী অক্সিডেশান হয়।

কেবলমাত্র জৈব পদার্থ থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন আসে না অন্য ভাবেও নাইট্রোজেন মাঠেতে আসতে পারে। কিন্তু সেগুলি এই ক্রিয়ার মাধ্যমে না এলে গাছের গ্রহণোপযোগী হয় না। সুতরাং তারা প্রায়ই গাছের অগ্রহণীয় থেকে যায়। জৈব পদার্থ থেকে যে নাইট্রোজেন তৈরী হয় তার শতকরা ৫ভাগ মাত্র গাছের গ্রহনীয় হয়ে থাকে।

গাছের যে সমস্ত শিকড় মাটিতে থাকে তাতে নানা প্রকার বীজাণু থাকে। এই বীজাণু থেকে অনেক সময় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে এজোটা ব্যাকটার, এরা মাটির মধ্যে যে সমস্ত জৈব পদার্থ থাকে তাদের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। তার ফলে কিছু নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। বিশেষতঃ যদি কোন মাটিতে এই জাতীয় জৈব সার দেওয়া যায় সেই মাটিতে এর বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সুতরাং মাটিতে পচা খড়, কুটা, ফসল জাতীয় গাছের ডাঁটা, ইত্যাদি যদি ভাল ভাবে মাটির তলে দিয়ে পচান যায় তবে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পাবে। মাটিতে যদি ঝোলা

গুড় বা গুড়ের ও চিনির গাদ মিশান যায় তবে মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে মাঠের ফসল দেড়গুণ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। মাটিতে গুড়ের গাদ মিশানর ফলে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হবে ও গাছের গ্রহণ যোগ্য এদের নাইট্রোজেন জাতীয় সার তৈরী করবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নাইট্রোজেনকে গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা এদের বেশী। কারণ এরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মিশ্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করবার সময় বহু পরিমাণে শক্তি বার করে দেয়। সেগুলির দ্বারাই এটা সম্ভব হয়। মাটিতে ফসল বাড়াবার জন্য যে সারই যোগ করা হোক না কেন সবগুলি মাটি লাঙ্গল দিয়ে চষার সময় দিলে মাটিকে বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে ফসলোৎপাদনের উপযুক্ত করতে সাহায্য করবে। সে কারণ অন্ততঃ ১ মাস আগে মাটিতে গুড় জাতীয় সার যোগ করা উচিত।

নডুল জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আমরা বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন পেতে পারি। এই জাতীয় বীজাণু কেবলমাত্র লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে বেশী থাকে। সুসার্ণ (আলফালফা') ক্লোভার জাতীয় গাছ, মটর, বীন, শিম জাতীয় গাছ, চীনাবাদাম ক্রোটা লারিয়া, কটো-পাইন গাছের শিকড়গুলি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে গাছের শিকড় মাঝে মাঝে ফুলে উঠেছে। এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে এনে শিকড়ে জমা করে। এই অংশে শতকরা ২·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে যদি ধরা যায় যে সুসার্ণ একরে ৪টন উৎপন্ন হয় তবে এদের শিকড় থেকে ২০০পাউণ্ড বা তার বেশী নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। এই নাইট্রোজেন সবটা গাছ বাতাস থেকে সংগ্রহ করেনি। এর কিছুটা গাছ মাটি থেকেও সংগ্রহ করে। কিন্তু তার পরিমাণ খুব কম। লেগুমিনাস জাতীয় গাছ ছাড়া অন্য গাছের শিকড় বা দেহ থেকে এত

বেশী নাইট্রোজেন পাওয়া যায় না। বারসীম লেগুমিনাস জাতীয় গাছ নয় বারসীম গাছ থেকে একরে মাত্র ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নডুল বীজাণু মাটি থেকে শতকরা ২৫ভাগ নাইট্রোজেন এভাবে সৃষ্টি করে। তা হলে লুসার্ণ গাছ যে ২০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে তার ১৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আসে বায়ু থেকে।

এ ভিন্ন মাটিতে আর একরকম নাইট্রোজেন জাতীয় সার বৃদ্ধি করা যায়। যথেষ্ট পরিমাণ আবর্জ্জনা সার যোগ করে। মাঠ থেকে যখন আমরা ফসল কেটে নিয়ে আসি তখন এই গাছের মাধ্যমে ও শষ্যের মাধ্যমে মাঠ থেকে বহু পরিমাণ নাইট্রোজেন চলে আসে। কিন্তু মাঠে যদি গৃহপালিত পশুর জন্য কোন ঘাস জাতীয় ফসল করা যায় তবে সেগুলি খেয়ে গৃহপালিত পশু, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর ইত্যাদি ভাল-ভাবে বাড়বে। আর এদের মলমূত্র ও গোয়ালে বিছানো খড়কুটা থেকে যে পরিমাণ সার মাঠ থেকে চলে গেছে তার শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন সার পূরণ করা যেতে পারে। এর ফলে দেখা যায় যে জমির উৎপাদিকা শক্তি একটুও কমে নি। বরং উত্তরোত্তর উর্ব্বরতা বেড়ে যাবে—কৃষকও পশু বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করবে কিম্বা গাইয়ের দুধ বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সা পাবে। কিন্তু আমাদের দেশেতে এভাবে চাষবাস হয় না। কারণ ধর্ম্মান্ধতা, অজ্ঞতাও উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাব। এই কারণে আমাদের দেশের কৃষকের সব সময় নজর থাকে কি করে কোন অর্থকরী ফসল বা খাদ্য জাতীয় ফসল মাঠে তৈরী করতে পারে। ফলে বৎসরের পর বৎসর মাঠেতে একই ফসল তৈরী করে চলে। এতে মাটি বছরের'পর বছর একই ফসল করার ফলে মাঠ থেকে

একই জাতীয় সার হ্রাস পাচ্চে। তার পূরণের আর কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ফলে জমি আজ রিক্ত হয়ে আসছে।

আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ মাঠে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে দুইটী ফসল করে—ধান ও গম। মাঠ থেকে যখন এই ফসল কেটে আনে তখন গাছের দেহের ও শস্যের মাধ্যমে মাঠ থেকে নাইট্রোজেন উঠে আসে। তারপর যখন ঐ শস্য বা খড়কুটা বিক্রী করে তখন পরোক্ষভাবে মূল্যবান নাইট্রোজেন বিক্রী হয়ে চলে যায়। এর ফলে মাঠের যে ক্ষতি হলো তার কোন পূরণ হয় না। কেবলমাত্র মাটিতে গাছের যে গোড়া থাকে সেগুলি মাটির সহিত মিশে ও পচে কিছু পরিমাণ মাটিতে সার যোগ করে মাত্র। এই কারণে কৃষককে দুইটী পথ অবলম্বন করা উচিত—যথা কৃষক পরিবারে উপযুক্ত পরিমাণ পশু পালন করা উচিত এবং তাদের মলমূত্রাদি ভাল ভাবে রক্ষা করে এ থেকে আবর্জ্জনা সার করা ও মাঠেতে উপযুক্ত সময় ছড়িয়ে দেওয়া (২) অন্ততঃ বৎসরে একবার লেগুমিনাস জাতীয় সবুজ সার যোগ করা। কিন্তু আমাদের সমস্যা অনেক, পশুর গোঁবর জালানি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হয় ফলে এটা নষ্ট হয়ে যায়। আর পশু মাঠে চরবার সময় যে সমস্ত মলমূত্র ত্যাগ করে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকের উচিত এগুলিকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা। মাঠেতে ইতস্ততঃ পড়ে মূত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু মলগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করে আবর্জ্জনা সার তৈরী করা কষ্টকর নয়।

আমাদের দেশের কৃষকের জমির পরিমাণ খুব কম। অনেকের কোন জমিই নাই। তারা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে কিম্বা অন্যের জমিতে মুনিস খাটে যাদের নিজস্ব জমি আছে তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে নিজেদের ভরণ পোষণ এর জন্য উপযুক্ত খাদ্য জাতীয় ফসল তৈরী করা।

তার ফলে কৃষক প্রয়োজন মত ধান উৎপাদন করে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে পাট উৎপন্ন করে। সুতরাং তার পক্ষে একটি ফসল নষ্ট করে গৃহপালিত পশুর জন্য কোন ফসল করা বা মাটিতে সবুজ সার যোগ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তা বাদে যেখানে কৃষক ভাগচাষী সেখানে মনিবের নির্দ্দেশানুসারে কোন খাদ্য জাতীয় ফসল বা অর্থকরী ফসল ছাড়া উপায় থাকে না। এর একমাত্র উপায় যখন মাঠে খাদ্য জাতীয় বা অর্থকরী কোন ফসল রোপণ করা হয় তখন সেই সময়ে মাটিতে সবুজ সারের বীজ কৃষকের রোপণ করা উচিত। তারপর উপযুক্ত ভাবে বেড়ে উঠলে ওটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

ধরা যাক একটি কৃষক ঠিক করলো যে একটি জমি থেকে ধান ও পাট উৎপন্ন করবে। সুতরাং সেই কৃষক মাঠেতে চৈত্র বৈশাখ মাসে পাট বীজ ছড়ানর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু শানহেম্প বা ধনচার বীজ ছড়িয়ে দেবে। এরা এক সঙ্গে বেড়ে উঠবে তারপর বর্ষার সময় হলে ধনচার গাছগুলি তুলে নরম মাটিতে পা দিয়ে চেপে দেবে। পরে যখন এই খেতে ধান করা হবে তখন তার পরিমাণ যে বেশী হবে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। যদি মিশ্র ফসল করার অসুবিধা হয় তবে খেতের চারিপাশে সামান্য পরিমাণ স্থানে কেবলমাত্র ধনচার বীজ ছড়িয়ে দিলে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে এই গাছ ভাল বেড়ে উঠবে এবং সময় মত মাটির নীচে চাষ দিয়ে চাষ দেওয়ায় অসুবিধা হবে না। এতে মাঠের পরবর্ত্তি ফসল নিশ্চয়ই বাড়বে।

যে কৃষক উপযুক্তভাবে পশুপালন ও উপযুক্তভাবে পশুর মলমূত্রাদি রক্ষা করেন তাকে মাঠের ফসল বাড়াবার জন্য সার কিনতে হয় না। কারণ নিজের প্রয়োজনানুযায়ী শস্য রেখে যদি খড় কুটা মলমূত্রাদি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে তাতে যে কেবলমাত্র জমির উর্ব্বরতা বাড়বে তা নয় তার আয়েরও পথ সুগম হবে। আমাদের দেশে প্রত্যেক

কৃষক পরিবার গরু বা অন্য কোন পশু দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি চষে। কিন্তু দিন দিন ট্রাকটরের চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আরও একটা উপায়ে মাটিতে কিছু নাইট্রোজেন যোগ হয়। বাতাসে শতকরা ৭৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। বর্ষার আগে কিম্বা বর্ষা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় আকাশে প্রচুর জলকণা থাকে। জল মধ্যকার হাইড্রোজেন (কারণ জল হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ) ও বাতাসের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেন এই বিদ্যুতের প্রভাবে মিলিত হয়ে এমোনিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমে বাষ্প আকারে থাকে তারপর বৃষ্টির জলকণার সহিত মিশে মাটিতে পড়ে। এই নৈসর্গিক উপায়ে মাঠেতে কিছু এমোনিয়া যোগ হয়।

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশে মাঠেতে রাসায়ণিক সার যোগ করার রীতি প্রচলিত আছে। কেবলমাত্র একক কোন রাসায়নিক সার মাঠেতে যোগ করা হয় না। অনেক কৃষক নিজেদের মাঠের মাটির সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করায় ও মাঠেতে যে ফসল করবেন তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রাসায়ণিক সার মিশ্রিত করে কিম্বা একের পরে আর একটী সময়ানুযায়ী যোগ করে থাকেন। এ ভিন্ন বাজারেও মিশ্র রাসায়ণিক সার পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রোজেন জাতীয় রাসায়ণিক সারগুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) নাইট্রেট। অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত মিশে নাইট্রিক এসিড যে মিশ্র যোগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যেমন সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি। (২) এমোনিয়া ও

এমোনিয়ার সহিত প্রস্তুত মিশ্র পদার্থ সমূহ। এগুলি আমাদের দেশে খুবই চলতি। এদের মধ্যে প্রধান এমোনিয়াম সালফেট বা লবণ সার। একে বলা হয় "যাদুকরের যষ্টি"। (৩) ক্যালসিয়াম সায়নামাইড ও ইউরিয়া। ইউরিয়া অতি সহজেই তরল পদার্থে পরিণত হয়। সুতরাং আমাদের দেশে বর্ষাকালে অনেক সময় দেখা যায় সারের বোরা পড়ে আছে ভিতরে কোন সার নেই। এ ভাবে অতি সহজেই জলে মেশার ফলে মাঠেতে ছড়ালে জলের সঙ্গে বাইরে চলে যেতে পারে। (৪) গাছ ও জৈব সার।

বিভিন্ন সারে নাইট্রোজেনের ও অন্যান্য সারের পরিমাণ।

	নাঃ	প্রাঃ ফঃ	পঃ
সোডিয়াম নাইট্রেট	১৬.০	—	—
সোডাপটাশ নাইট্রেট	১৫.০	—	১৫.০
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	১৫.৫	—	—
এমোনিয়াম সালফেট	২০.৫	—	—
তরল এমোনিয়া	২০.৬	—	—
এমোনিয়াম ফসফেট	১১ ০	৪৮.০	—
এমোনিয়াম ক্লোরাইড	২৪.০	—	—
এমোনিয়াম নাইট্রেট	৩২.৫	—	—
ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড়	২১.০	—	—
ইউরিয়া	৪২.০	—	—
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	১৫.৫	—	—
এমোনিয়াম ফসফেট নাইট্রেট	২৫.০	—	—

	নাঃ	প্রাঃ ফঃ	পঃ
এমোনিয়াম পটাসিয়াম ফসফেট	৫.৫	৫৪.০	১৮.০
	নাঃ%	ফঃ%	পঃ%
তুলাবীজ	৭.০	৩.০	৪.০
রেড়ির বীজ	৫.৫	১.৫	১.৫
কোকো হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি	২.৫	১.০	২.০
তলানি সার (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত)	৬.০	৩.০	০.৫
তলানি সার (মলমূত্রাদি থেকে)	২.০	২.০	০.০
শাক সব্জীর তলানি সার	২.০	১.৪	১.৫
মাছের কাঁটা ও আঁইস	৯.৫	৭.০	০.০
মলমূত্রাদি থেকে প্রস্তুত তলানিসার (শ্লাজ)	২.০	২.০	০.০
পাখির বিষ্ঠা (বাদুড়)	৪.৫	৫.০	১.৫
তামাকের ডাটা	২.০	০.৫	৬.০
হাড়ের গুঁড়া	২.৫	২৫.০	—
কালা মাটির উপরের পচাপাতা	২.০	০.০	০.০
শুকনো রক্ত	১৩.০	২.০	১.০
গরুর শুষ্ক গোবর	২.০	১.১	২.০
পশমের টুকরো পচানি	৩.৫	০.৫	২.০
চিংড়ী মাছের খোলা পচানো	৭.০	৪.০	১.০
কদম বীজ পচানো	৭.০	১.৫	১.৫

স্থান কাল ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর এদের ব্যবহার নিরূপিত হয়। এমোনিয়াম সালফেট আজ প্রায় সর্বদেশে সকল মাটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুটা সুবিধার জন্য ও কিছুটা ফলপ্রাপ্তির

জন্য সারের মধ্যে এর স্থান সকলের উপরে। একে সারবিদেরা নাম দিয়েছেন "যাদুকরের যষ্ঠি"। সত্যই প্রায় সকল মাটিতে এদিয়ে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। তবে মাটিতে কিছু পরিমাণ জলকণা না থাকলে এমোনিয়াম সালফেট জলের সহিত মিশে গাছের গ্রহণ উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু নাইট্রেট জাতীয় সার গাছ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে। কারণ গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে। সুতরাং যদি মাটিতে কোন নাইট্রেট সার যোগ করা যায় তবে খুব সত্বরই সেটা গাছের গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সব থেকে অসুবিধা এই যে সকল নাইট্রেট জাতীয় সারগুলি অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যেতে পারে ও মাঠ থেকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একে মাটিতে ছড়িয়ে আমাদের মত বৃষ্টিবহুল দেশে অনেক সময়ই বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে গাছ যখন বেড়ে ওঠে তখন মাটি খুঁড়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিলে (top dressing) ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় চাষীরা লাইন করে মাটিতে সার দিয়ে থাকেন। তবে যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এই সার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। ইউরিয়া অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যায়। এমনি সাধারণ অবস্থায় একে ফেলে রাখলে বর্ষাকালে এর অস্তিত্ব থাকে না, ঠিক লবণের মত গলে যায়। সুতরাং আমাদের দেশের যে অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এর ব্যবহার করে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। কারণ জলের সঙ্গে মিশে জলস্রোতে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে।

ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড সবুজ গাছের সঙ্গে মাঠেতে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ এই জিনিষ মাটিতে সবুজ লতা পাতা পচিতে সাহায্য করে ও মাটিতে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে।

সে কারণে যে মাঠে সবুজ সার করা হয় সেখানে গাছ মাটির তলায় চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড মাটিতে ছড়ান যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যায়!

আজ কাল মিশ্র সার মাঠে ছড়ানর রীতি হয়েছে। কেবল মাত্র কোন একটী সার দেওয়ার চেয়ে দেখা যায় যদি ২।৩টী রাসায়ণিক সার মিশ্রিত করে মাটির প্রয়োজনানুযায়ী দেওয়া যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কেবলমাত্র একটী রাসায়ণিক সার দিলে তাড়াতাড়ি সেই সার মাটির সহিত মিশে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়েছে·কিন্তু যদি ২।৩টি রাসায়ণিক সার একত্র মিশ্রিত করে দেওয়া যায় তবে একে অন্যকে খুব তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশতে দেয় না। সেই কারণে যদি কোন মাঠেতে একটীমাত্র নাইট্রোজেন জাতীয় সার যোগ করতে হয় তবে খুব যত্নসহকারে কোনটী যোগ করা উচিত সে সম্বন্ধে মাটির আকৃতি ও প্রকৃতি, সেখানকার বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিবেচনা করে' নিরূপণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে সকল দেশেই প্রচুর গবেষণা চলছে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নাইট্রেট আকারে। অনেক জায়গায় মাঠে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে আবার মাঠে চুণ দিয়ে অম্ল মাটিকে নিরপেক্ষ রেখায় আনার জন্য এর সঙ্গে ম্যাসিনেসিয়াম নাইট্রেট যোগ করে থাকেন। এদের মধ্যে সোডিয়াম নাইট্রেট সারটী খুবই প্রচলিত। সার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে একে কেবলমাত্র সোডিয়াম নাম দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে আণ্ডিজ পর্বতে প্রচুর সোডিয়াম ও পটাসিয়ম নাইট্রেট পাওয়া যায়। পাহাড়ের গা থেকে এই পদার্থগুলি

নিয়ে এসে গুঁড়া করে মাঠে যোগ করবার মত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক দিন থেকে উত্তর আমেরিকায় এর গবেষণা চলছে। আমাদের দেশেও এর প্রচলন বাড়ছে কারণ গাছ একটু বেড়ে উঠবার পর মাটিতে যোগ করা খুব সহজ।

যে সমস্ত নাইট্রেট জাতীয় সার বাজারে পাওয়া যায় সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোন মাটিতে অন্য যে কোন জাতীয় নাইট্রেট সার থেকে সোডা নাইট্রেট বেশী কার্য্যকরী। এর সঙ্গে যদি কোন এমোনিয়াম জাতীয় সার ও একটী জৈব সার মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে কেবলমাত্র সোডিয়াম নাইট্রেট দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় তার থেকেও বেশী সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এটা ভুললে কিছুতেই চলবে না—যে যে কোন নাইট্রেট জাতীয় সার অতি সহজেই জলের সহিত সহজ দ্রব্য। সোডিয়াম নাইট্রেট মাটিতে ছড়িয়ে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে মাটিতে কোন অম্লতা নেই (alkaline) সেখানে যদি বছরের পর বছর এই সার যোগ করা যায় তবে সেই মাঠের সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী হয়ে পড়বে ও এর ফলে মাঠের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এমন কোন সঠিক ফল পাওয়া যায় নি। যখন গাছ মাটিতে শিকড় মেলে বেশ কায়েমী হয়ে বসে, অন্ততঃ অঙ্কুরোদ্গমের ১২।১৪ দিন পরে ও চারা গাছ পুতবার ঐ সময় পরে, পুনরায় অন্ততঃ ১৫ দিন পরে যদি এই সার মাঠেতে দেওয়া যায়, তবে অতি সত্বর এই সার গাছের অনুলোমের সংস্পর্শে আসে ও ব্যবহার উপযোগী হয়। অনেক সময় এই নাইট্রেট—পটাশ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি গাছের খাদ্য জাতীয় পদার্থের সহিত মিশে মাঠে পড়ে, এতে মাঠে ঐ সমুদয় পদার্থের পরিমাণ একটু বাড়ে।

যখন মাঠেতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সার দেওয়া হয় তখন এই নাইট্রেট সার অধিকাংশ বিষয়ে সোডিয়াম নাইট্রেট-এর মত কাজ করে। তা বাদে এই ক্যালসিয়াম অনেক সময় গাছের দরকার হয়। কিন্তু সোডিয়াম প্রয়োজন গাছের প্রায় নাই বললেই চলে। তবে এই সারের বিশেষ অসুবিধা এই যে এগুলি বাতাস থেকে খুব বেশী জলকণা আহরণ করে একে মাঠে ছড়াবার সময় বিশেষ বেগ পেতে হয়। তবে যদি খুব ভালভাবে একে কাগজের প্যাকেটে করে প্যাক করা হয় তবে এইভাবে নষ্ট হওয়ার ভয় কম থাকে। কিন্তু একবার এই প্যাকেট খুললে তাকে আর ফেলে রাখা উচিত নয়।

এমোনিয়াম নাইট্রেটে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। এতে খুব বেশী নাইট্রোজেন থাকে তার ফলে মাঠে সারের প্রয়োজন অতি অল্পই। ফলে খরচও কম পড়ে। এ-ছাড়াও এর মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে ৫০%, এমোনিয়া নাইট্রোজেন জলের সহিত মিশে এর বেশী ক্ষতি হতে পারে না। এর প্রধান অসুবিধা এতে কোন ধাতব পদার্থ বা ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম থাকে না। তার ফলে একই মাটিতে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে মাটির অম্লতার পরিমাণ একটু বেড়ে যেতে পারে। পরে এই অম্লতা দূর করতে গেলে মাঠে চুণের ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১০০ পাঃ—এমোনিয়াম নাইট্রেটের জন্য ৫০ পাঃ চুণ-এর দরকার।

এমোনিয়া জাতীয় নাইট্রোজেন।

এমোনিয়া জাতীয় যত রকমের সার আছে তার মধ্যে প্রধান দুইটী। (১) এমোনিয়াম সালফেট ও (২) এমোনিয়াম ফসফেট। এমোনিয়াম সালফেট সার তৈরী করা হয় এমোনিয়া এর সহিত সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে। আর এমোনিয়াম ফসফেট সার তৈরী করা হয় এমোনিয়া

বাষ্প এর সহিত ফসফরিক এসিড মিশিয়ে। আমাদের দেশে অবশ্য তরল এমোনিয়া মাটিতে ছড়ান হয় না! কিন্তু আমেরিকার কোন কোন অংশে তরল এমোনিয়া ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কোন ঢাকা পাত্রে এই তরল এমোনিয়া মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর কোন নালা দিয়ে বা কোন ফুটা পাত্রে করে (যেমন বৈশাখ মাসে ঝাঁরি করে অশ্বত্থ মূলে জল দেওয়া হয়) ট্রাক্টর সহযোগে লাইন এ ছড়ান হয়। মনে রাখতে হবে যে যদি কোন সবুজ গাছের উপর পড়ে তবে সে গাছ মরে' যেতে পারে। মাটির উপরে ছড়াবার ফলে কিছু তরল এমোনিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

এমোনিয়াম জাতীয় বিভিন্ন সারের মধ্যে কোনটিতে কতটা নাইট্রোজেন থাকে তার একটী বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১নং চার্ট দ্রষ্টব্য)। বাজারে যে সমস্ত সার বিক্রী হয় বা যে সমস্ত সার হাজার হাজার মণ তৈরী হয় সে সবগুলিতে ঠিক এই পরিমাণ নাইটোজেন থাকে না। কারণ বাজারে সারের জন্য যে সমস্ত রাসায়ণিক পদার্থ তৈরী হয় সে সবগুলিতে কিছু পরিমাণে ময়লা থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য সব সময়ই দেখা যায় যে নাইটোজেনের পরিমাণ সব সময়ই কিছু কম।

এই জাতীয় সারের স্থবিধা এই যে যে খুব তাড়াতাড়ি জলের সহিত মিশে মাটির নীচে ঢুকে যেতে পারে না। মাটিতে এমোনিয়াম সালফেট ঢেলে দেবার পর সাধারণতঃ সামান্য মাত্র জলের সহযোগে এমোনিয়াম সালফেট দুইভাগে বিভক্ত হয়। এমোনিয়া (NH_3) এবং (SO_4)। এমোনিয়ার কাজ হয় মাটির মধ্যে যে মিশ্র চুণ জাতীয় পদার্থ আছে তার থেকে ক্যালসিয়াম সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসে পড়া। এর ফলে যতদিন না বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্র নাইট্রেট জাতীয়

পদার্থে পরিণত হয় ততদিন ইহা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় না। কিম্বা জলের সহিত মিশে ধুইয়ে যেতে পারে না। এটা নির্ভর করে মাটির নীচে কতটা তলায় সার দেওয়া হলো তার উপরে। আরও কয়েকটী বিষয়ের উপরও এই ক্রিয়া নির্ভর করে যেমন মাটিতে জলকাদার পরিমাণ, জল সেচন চুণ জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি। কারণ চুণ জাতীয় পদার্থ ইহাকে মাটিতে নাইট্রেট আকারে পরিণত হতে সাহায্য করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যদি এই সালফেট অব এমোনিয়া সারকে লাঙ্গলের ফলা যতদূর যায় সেই পরিমাণ মাটির নীচে এই সার দিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ আনুমানিক ৩"—৪" মধ্যে তবে ভাল ফল পাওয়া যায় আর উৎপাদিত শস্যও বেশী পাওয়া যায়।

এমোনিয়াম সালফেটের প্রধান অসুবিধা ইহা মাটিকে উত্তরোত্তর অম্লতর করে তোলে অর্থাৎ প্রতি বৎসর যদি একই জমিতে এই সার ব্যবহার করা হয় তবে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ পাঃ এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করার ফলে মাটিতে যে অম্লতা বৃদ্ধি পায় তার নিরশনের জন্য সেই পরিমাণ জমিতে মাটির অম্লতা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ১১০ পাঃ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যোগ করতে হয়। মৃৎ-বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মাটিতে কোনরকমের অম্লতা নিবারক পদার্থ না দিয়ে যদি প্রতি বৎসর এই সার যোগ করা হয় তবে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পাবে এমন কি একেবারে অনুর্ব্বর মাটিতে পরিণত হতে পারে।

এ বিষয়ে একটী জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা বলেন যে যে মাটিতে বিলাতী সার (এমোনিয়াম সালফেট) ব্যবহার করা হয় সে মাটিতে সে বৎসর ভাল ফসল পাওয়া গেলেও পরে ভাল ফসল হয় না। অনেকে বলেন প্রতি বৎসর ঐ

সার না দিলে এবং সারের পরিমাণ না বাড়ালে উৎপাদন কমে যায়, কথাটা একরকম ঠিকই। কারণ আমাদের এই বাংলাদেশের ও ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের মাটির অম্লতার পরিমাণ ৫ থেকে ৬ pH ইউনিটের মধ্যে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই মাটি একটু অম্ল কারণ ৭—৭.৫ ইউনিট হলো নিরপেক্ষ রেখা। আর এক এক ইউনিট ১০ গুণ অম্লতা বৃদ্ধি ও কমতি নির্দ্দেশ করে। তাই যে মাটির pH ইউনিট ৬ সেই মাটিতে ১০ গুণ অম্লতা বেশী। আর যে মাটির অম্লতার পরিমাণ pH ইউনিট ৫ সে মাটি ১০০ গুণ অম্লতা বেশী।

স্থতরাং আমাদের এই অঞ্চলের মাটিতে অম্লতার পরিমাণ একটু বেশী। এই অবস্থায় যদি বৎসরের পর বৎসর এমোনিয়াম সালফেট যোগ করা হয় তবে মাটিতে আরও অম্লতা বেড়ে যাবে। এক একটী ফসল এক একটী বিশেষ অম্লযুক্ত মাটিতে ভাল হয়। স্থতরাং যে মাটির pH ইউনিট এখন ৫.৬ সেখানে ভাল ধানের ফসল পাওয়া যাচ্ছে। ২।৩ বৎসর পর পর কোন রকম চুণ না ছড়িয়ে সেই মাঠে যদি বেশী মাত্রায় এমোনিয়া সালফেট ছড়িয়ে যাওয়া যায় তবে সেই মাটির pH ইউনিট কমে যাবে এবং সেই অম্লতায় ভাল ধান জন্মিবে না। এর ফলেই কৃষক বলেন যে প্রথম বৎসর জমিতে ভাল ফসল পাওয়া গেলেও পরে আর ভাল ফসল পাওয়া যাবে না।

এই যে সমস্যা এটা আদৌ দূরপনেয় নয়। পরিমাণ মত চূণ মাঠেতে ছড়ালে ফসলের মাত্রা বেড়ে যাবে। কিন্তু যে মাটিতে অম্লতা কম বা লোনার পরিমাণ বেশী সেখানে এর ব্যবহার ঠিক নহে। সেখানে মাটিতে গন্ধক ছড়াতে হয়। এর ফলে মাঠের লোনা অংশের হ্রাস পায়।

আমাদের আদৌ ভুললে চলবে না প্রথমেই জানা উচিত কোন

পদার্থের কি দাম? কারণ কৃষক মাঠে সার দিতে গিয়ে প্রথমেই খতিয়ে দেখবে যে কোনটার কত দাম। এমোনিয়াম সালফেট দামেও সস্তা ও ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। তার ফলে কৃষককে মাঠে চূণ দিতে হলেও কৃষক মাঠে এই সার দিতে খুব রাজী।

বাজারে যে সমস্ত এমোনিয়া জাতীয় সার পাওয়া যায় তার মধ্যে সব থেকে কম দাম এমোনিয়ার। কারণ যখন কয়লা থেকে জ্বালানি গ্যাস তৈরী করা হয় তখন তার থেকে এই তরল এমোনিয়া পাওয়া যায় বাড়তি পাওনা হিসেবে (bye-product)। তা বাদে বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন যদি বিদ্যুতের সংস্পর্শে পোড়ান যায় তবে তা থেকে এমোনিয়া পাওয়া যেতে পারে। এই এমো-নিয়ার সহিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন মিশ্র পদার্থ তৈরী করে মাঠে ছড়ান যায়।

ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড নামক মিশ্র সারেতে যে নাইট্রোজেন থাকে সেই নাইট্রোজেন পাওয়া যায় বাতাস থেকে। লাইমষ্টোন (চূন জাতীয় পদার্থ) ও কয়লা সংমিশ্রণে এটা প্রস্তুত হয়। এই সার মাঠেতে ছড়ালে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পাবে দ্বিতীয়তঃ ছায়ানোজেন প্রভাবে মাঠেতে বীজাণুক্রিয়া বেড়ে যাবে। চাষের পূর্ব্বে যখন মাটি খোঁড়া হয় তা ছাড়া যখন মাঠেতে যন ঘাস ইত্যাদি আগাছা থাকে তখন এই সার দিলে মাটির বিশেষ উপকার হয়। ক্যালসিয়াম প্রভাবে মাটির অম্লতা হ্রাস পাবে তা বাদে যে সমস্ত আগাছা মাঠেতে থাকে কিম্বা যে সমস্ত ঘাস লাঙ্গল দেওয়ার ফলে মাটি চাপা পড়ে সে সবগুলি এই রাসায়ণিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে মাটির নীচে পচে গিয়ে ভাল সবুজ সারের সৃষ্টি করে। মাটিতে বীজ বপন বা কোন চারা গাছ লাগাবার অন্ততঃ ১০।১২ দিন আগে

এটাকে মাঠে ছড়ান উচিত কারণ যতদিন ছায়নামাইড থেকে ইউরিয়া স্থষ্টি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ছায়নামাইড ক্ষতি করে। মাঠেতে যথেষ্ট পরিমাণ রস বা জলকণা বা জল না থাকলে ছায়নামাইড থেকে এমোনিয়া স্থষ্টি হয় না। স্থতরাং যে মাঠেতে প্রচুর জল নেই সেখানে এই সার দিয়ে যদি বীজ ছড়ান হয় তবে সে বীজ নষ্ট হতে পারে। সে জন্য সব থেকে স্থবিধা যখন সবুজ সার তৈরী করতে গিয়ে লেগুমিনাস জাতীয় কোন গাছই হোক বা নন্ লেগুমিনাস জাতীয় গাছই হোক লাঙ্গলের ফলা মুখে যখন মাটির নীচে দিয়ে দেওয়া হয় তখন যদি এই সার প্রচুর পরিমাণে ছড়ান যায় তবে গাছের পচন-ক্রিয়ায় বিশেষ সহায়তা করে। মাঠেতে প্রচুর ঘাস থাকলে একবার মাত্র লাঙ্গল দিয়ে যদি এই সার ছড়ান যায় তবে বিশেষ ফল পাওয়া যায় কারণ এই সার ঘাসগুলিকে মেরে ফেলতে সাহায্য করবে। আগাছা মারবার জন্য এর ব্যবস্থা খুবই চলতি। এতে এদের নাইট্রো-জেনের পরিমাণ একটুও কমে না। এই কারণে সকালবেলা যখন মাঠেতে শিশিরকণা পড়ে থাকে তখন ছড়ালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইউরিয়া নামক অজৈব বা রাসায়নিক সারেতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী। ইহা দেখ্তে সাদা। মাটিতে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় এমোনিয়া, স্থতরাং ফল প্রায় এমোনিয়ার অনুরূপ। এ দিয়ে মাটির অম্লতার পরিমাণ একটুও বাড়ে না। কিন্তু সবথেকে বড় কথা এ দিয়ে মাঠেতে নাইট্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় না। কতকটা এমোনিয়াম নাইট্রেটের মত। এ থেকে নাইট্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই মাঠেতে দেওয়া হয় না। তা বাদে এটা যখন খোলা বোরাতে থাকে তখন বাতাস থেকে জলকণার প্রভাবে গলে যায়।

জৈব নাইট্রোজেন।

প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ থেকে যে সার পাওয়া যায় সাধারণতঃ তাকে জৈব সার বলা হয়। এই সারের মধ্যেও নাইট্রোজেন থাকে এই নাইট্রোজেনকে জৈব নাইট্রোজেন বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। প্রাণীদের মলমূত্রে ও পশু পাখির বিষ্ঠাতে নাইট্রোজেন থাকে। মাছের শক্ত আঁইস, যেখানে পশু ও পাখী কাটা হয় সেখানকার আবর্জ্জনা ও রক্তে, বিভিন্ন তৈলবীজে যেমন তুলাবীজ, রেড়ির বীজ, সরিষার খইল ও তিসির বীজ প্রভৃতি তৈল জাতীয় বীজ থেকে তৈল পিষে নেওয়ার পর যে সমস্ত খইল জাতীয় পদার্থ থাকে সেই সকল পদার্থেও নাইট্রোজেন থাকে। এর একটা তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে। খইলের ব্যবহার আমাদের দেশের চাষীদের কাছে একটুও আধুনিক নয়। কারণ শীতকালে যে সমস্ত শাকসব্জী উৎপন্ন করা হয় সে সমস্ত সব্জী জাতীয় ফসলের জন্য সব সময়ই খইলের ব্যবহার হয়ে আসছে। এদিয়ে মাটির কোন ক্ষতি হয় না। তবে এতে নইট্রোজেন বা ফসফরাস খুব কম মাত্রায় থাকে।

কৃষকদের মধ্যে এই বিশ্বাসটী বেশ দানা বেঁধে আছে যে যদি গাছপালা পচান সার ও প্রাণিদেহ হইতে নির্গত বা জাত সার মাটিতে দেওয়া যায় তবে যে কেবলমাত্র মাটির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা নয় জমির মাটি উত্তরোত্তর উর্ব্বর হবে। একথা আজ বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করতে পারবেন না। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এতে এমন কতকগুলি রাসায়ণিক পদার্থ থাকে যারা মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গাছকে সাহায্য করে। এর মধ্যে কতকগুলি ধাতব পদার্থ থাক। মাটিতে এদের প্রয়োজন অতি অল্পই এবং অতি অল্প পরিমাণে থাকে।

কয়েক পি পি এম মাত্র। অর্থাৎ তার লক্ষ ভাগে ১ থেকে ৫ অংশ মাত্র। কিন্তু এদের প্রয়োজন আছে যেমন বোরণ, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, ক্লোরিণ, মলিবডিনাম ইত্যাদি। পরে এদের বিশদ আলোচনা করা হবে। এই জাতীয় প্রাণিজ সার বা জৈব সার মাটিতে ছিটিয়ে না দিয়ে যদি লাইন করে দেওয়া যায় তাহলে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়।

কৃষককে মাঠেতে সার দিতে গিয়ে কয়েকটী জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ নাইট্রোজেনের দাম বেশী হবে না। অনেক সময় অনেক সারের দাম কম কিন্তু তাতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তার পরিমাণ কম হওয়ায় মাঠেতে সারের পরিমাণ বেশী লাগে। ফলে যেমন দাম বেশী পড়ে যায় তেমনি ছিটাতে বা লাইনে সার দিতে খরচ বেশী হয়। অনেক সার আছে দামে বেশী কিন্তু মাটির প্রয়োজন কম হয় কারণ তাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী। এ বিষয়ে সব দেশের কৃষকেরা ওয়াকিবহাল হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ...যে সার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে একটু অসাবধান হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে সে সার কৃষক মাঠেতে ঢালতে দ্বিধা করে যেমন ইউরিয়া অতি সাধারণ অবস্থাতে বাতাস থেকে জলকণা টেনে নিয়ে কাদামাটির আকার নেয়। এতে এই সার কোন মাটির সহিত না মিশিয়ে বা জলে না মিশিয়ে ছিটালে এক জায়গায় বেশী পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে ঠিকভাবে সার ছিটান যায় না। তৃতীয়তঃ মাটিতে সার ছিটানোর সুবিধা। চতুর্থতঃ খেতের মাটির আকৃতি, প্রকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদি অনুযায়ী মাঠে শস্যোৎপাদন। এই সমস্তগুলি বিশেষ বিবেচনা করে কৃষক মাঠের জন্য সার নির্ব্বাচন করবেন। নাইট্রোজেন জাতীয় সব সারই কোন না কোন দেশে স্থায়ী আসন

করে বসেছে। এদের মধ্যে সালফেট অব এমোনিয়া ও এমোনিয়াম নাইট্রেট জাতীয় সারের বিক্রী বেশী। এর থেকে এদের প্রাধান্যই বোঝা যায়। সবার উপরে যে কোন একটী বিশেষ সার যোগ না করে একটা complete সার বা মিশ্র সার ব্যবহার করলে ভাল হয়। সাধারণতঃ যে সারে নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশ থাকে তাকেই complete সার বলা হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে কোন সার ইতস্ততঃ না ছিটিয়ে যদি লাইনে রোপন ও বীজ বপন করা যায় তবে তার থেকে বেশী ফল পাওয়া যায়। গাছ একটু বেড়ে উঠার পর যদি লাইনে সমান্তরালভাবে মাঠেতে তরল এমোনিয়া জলের সহিত মিশিয়ে পরিমাণ মত দেওয়া যায় তা হলেও ফল ভাল হয়।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে নাইট্রোজেন সারের কোন কারখানা ছিল না! আমাদের দেশের কৃষকেরা রাসায়ণিক সার ব্যবহারের পক্ষপাতীও ছিলেন না। সে সার বাইরে থেকে আমদানী করা হতো তা দিয়া পরীক্ষা ক্ষেত্রে কাজও চা বাগানের চাহিদা মিটতো। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিহারের সিন্ধ্রীতে একটা বড় সালফেট অব এমোনিয়া তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। দৈনিক ১০০০ হাজার টন ঐ সার ওখানে তৈরী হয়। এ দিয়ে আমাদের দেশের প্রকৃত চাহিদা মেটে না। ফলে এর উৎপাদন আরও বাড়াবার চেষ্টা চলছে, এ ভিন্ন ভাখরা নাঙ্গলে আর একটী সারের কারখানা তৈরী হচ্ছে। এদিয়েও আমাদের ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের চাহিদা মিটবে না। তাই ভারত সরকার আর একটী সারের কারখানা তৈরী করতে মনস্থ করেছেন।

ফসফরাস

ফসফরাস জাতীয় সার

বাজারে যে সমস্ত ফসফরাস জাতীয় সার দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সংমিশ্রণে প্রস্তুত $[Ca_3(PO_4)_3]_2$ CaF_2 প্রাণিদেহে যে হাড় আছে সেই হাড়গুলিতে ফসফরাস আছে। তা ভিন্ন উপরে যে রাসায়ণিক মিশ্র পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে ঐ আকারে পাথরের মধ্যে ও মাটিতে ঐ সার দেখা যায়। যে সমস্ত ফসফেট সার আমরা মাটিতে ছড়াই, সেগুলি ঐ পাথর থেকে তৈরী। পাহাড় থেকে ঐ জাতীয় মাটি সংগ্রহ করে তাতে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সহযোগে ঐগুলি তৈরী করতে হয়। অবশ্য আমাদের দেশের কোন পাহাড় বা পর্ব্বতে ঐগুলি পাওয়া যায় না। অন্য দেশে এগুলি পাহাড়ে পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে নিয়ে এসে মাঠে ছড়ানোর উপযোগী করে বিক্রী করা হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালে যে আগ্নেয় শিলা ছিল সেই আমলে যে সমস্ত পাথর ছিল সেগুলিতে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সেই আগ্নেয় শিলাতে ফসফরাস ছিল শতকরা ০.১৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানের চুণা মাটিতে শতকরা ০.০২% ফসফরাস। আর এদের মাঝামাঝি—স্যাণ্ডষ্টোন বা বালু-পাথরে ও সেলের মধ্যে ফসফরাস আছে ঠিক এদের মাঝামাঝি।

প্রাথমিক আগ্নেয় শিলা→স্যাণ্ডষ্টোন→সেল→চুণামাটির পাহাড়

চুণামাটির পাথরগুলি ক্ষয় পাচ্ছে। সেই ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত

অদ্রবণীয় ফসফরাস পাওয়া যায় সেগুলি মাটির সহিত না মিশে এক জায়গায় জড়ো হয়। এদিয়ে কিন্তু গাছের বিশেষ কোন কাজ হয় না। আগ্নেয় শিলাতে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে—আগ্নেয় শিলা থেকে তৈরী মাটিতে সে পরিমাণ ফসফরাস থাকে না। সাধারণতঃ মাটিতে ৬" জমির পরিমাণ নীচু পর্য্যন্ত শতকরা ০.২৫ ভাগ থেকে ০.১২৫ ভাগ পর্য্যন্ত ফসফরাস থাকে, যদি এক একর জমির মাটির ওজন হয়— ২,০০০,০০০ পাউণ্ড তবে সেই জমিতে ফসফরাসের পরিমাণ হবে মাত্র ২৫০০পাঃ।

মাটিতে অ্যাপাটাইট আকারে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ফসফেটের সহিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশে থাকে। এর থেকে ফসফরাস বেরিয়ে আসে অল্পই। তবে সেই মাটিতে যদি একটু জৈব সার বা আবর্জ্জনা সার দেওয়া যায় বা কোন সবুজ সার দেওয়া যায় তবে সেই মাটির মধ্যে যে সমস্ত ফসফেট থাকে সেগুলি নানাপ্রকার বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরমাণু অবয়বের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে কারণ এই সার থেকে কার্বনিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বার হয়ে' মাটির মধ্যকার বিভিন্ন মিশ্র পদার্থকে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করে। এর ফলে মাটির মধ্যকার বিভিন্ন রাসায়ণিক পদার্থ সহজে দ্রবণীয় মিশ্র পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু ফসফরাস মিশ্র দ্রব্যগুলি সহজে দ্রবীভূত হয় না।

মাটিতে জৈব সার দিলে সব থেকে বেশী ফসফরাস জাতীয় সার পাওয়া যায়। কারণ জীবদেহে ও জীবদেহ হতে নির্গত পদার্থ সমূহে খুব বেশী ফসফরাস থাকে। এদের দ্বারা যখন কোন আবর্জ্জনা সার তৈরী হয় তখন এই সারের কোন ক্ষয় হয় না। ফলে এই সার মাঠেতে দিলে সারের মধ্যকার সমুদয় ফসফরাস পাওয়া যায়।

মাটির মধ্যে বিভিন্ন রাসায়ণিক পদার্থের সহিত মিশে যে সমস্ত ফস-

ফরাস জাতীয় পদার্থ থাকে সেগুলি সব সময় গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় থাকে না। কিন্তু জীবদেহ জাত বা উদ্ভিদ হইতে জাত ফসফরাস জাতীয় পদার্থ অতি অনায়াসে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম-কালে এবং শীতপ্রধান দেশের শীতকালে যদি মাঠে কোন সবুজ সার বা ঢাকনি ফসল (cover crop) থাকে তবে তাদের শিকড়ে এভাবে মাটির মধ্যকার ফসফরাস গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় আসে। সেই গাছের পক্ষে তখন সেই ফসফরাস আর প্রয়োজন হয় না। পরবর্ত্তী ফসলের সময় এই ফসফরাস সার গাছ অতি সহজেই টেনে নিতে পারে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কোন এক বিশেষ ফসলে এই সার দিয়ে তার কোন ফল পাওয়া গেল না। কিন্তু সেই মাঠের এর পরবর্ত্তী ফসলে এই সারের প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় মাঠে তিনগুণ সুপার ফসফেট (triple) দিয়ে ২য় ও ৩য় ফসলে এসে এর সুফল পাওয়া গেছে।

মাটিতে ফসফরাসের চাহিদা

যে অবস্থাতেই হৌক মাটিতে ফসফরাস জাতীয় সার প্রয়োগ করলে—মাটিতে এই জাতীয় সার প্রয়োগ করার সাথে সাথে ফস-ফরাস জাতীয় মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে অবস্থিত ক্যালসিয়াম, লৌহ ও এলুমিনাম ফসফেটের সহিত মিশ্রিত হয়ে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এমন কি কোন অতি সহজে দ্রবনীয় এই জাতীয় কোন সার মাটিতে যোগ করার সাথে সাথে এই ফসফরাস সার অন্য ধাতব পদার্থের সহিত মিশে নূতন একটা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং উহা আর গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। যদি সেখানকার মাটি অম্ল থাকে অর্থাৎ pH ইউনিট আনুমানিক ৫ থাকে তবে ঐ

মিশ্র যৌগিক পদার্থ মাটিতে অবস্থিত জলকণার সাহায্যে দ্রবনীয় হয়ে পড়ে। মাটিতে ফসফরাস জাতীয় সার দেওয়ার সাথে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সহিত মিলে তাদের চাহিদা মেটায়। তাদের চাহিদা মিটে গেলে যে অবশিষ্ট ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিশে থাকে তাহা গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। যাহাতে এই ভাবে সারের ক্ষতি না হয় তার জন্য লাইনে ফসফরাস সার দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে এই ফসফেট সারের সংস্পর্শে যে মাটি আসবে তার পরিমাণ কম। সুতরাং এই মাটির প্রয়োজন মিটে গেলে নূতন যে মিশ্র পদার্থ তৈরী হয় তাহা সহজেই গাছের গ্রহনীয় হবে। কিন্তু সারের যে অংশ ঠিক মাঝখানে থাকে সেগুলি ঠিক তাড়াতাড়ি মাটির ছোঁয়া পায় না। তার ফলে তারা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু যে মাটি এর সংস্পর্শে আসবে তারা সহজে এর গ্রহণযোগ্য হয়।

যে মাটিতে চুণের সহযোগে মাটির অম্লতা নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই মাটিতে এই সার ছড়িয়ে বিশেষ উপকার পাওয়া গেছে। কিন্তু যে মাটিতে একটু অম্লতা বেশী অর্থাৎ অন্ততঃ pH ৫ ইউনিটের কম সেখানে এই জাতীয় সুপার ফসফেট দিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটিতে যে লৌহ ও এলুমিনাম থাকে সেগুলি অতি সহজে দ্রবনীয় হয় না। বরং অণুর মধ্যকার লৌহ ও এলুমিনাম সরিয়ে দিয়ে ক্যালসিয়াম সেখানে বসে পড়ে। লৌহ এলুমিনাম আর সহজে দ্রবনীয় থাকে না। ফলে ফস-ফরাস, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ও ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট এই আকারে মাটিতে তলানি পড়ে। গাছ শিকড় দিয়ে ঐগুলি তাড়াতাড়ি টেনে নিতে পারে। কিন্তু ঐ ফসফরাস যদি লৌহ ও

এলুমিনামের সঙ্গে মিশে তবে তাহা আর গাছের গ্রহণযোগ্য হয় না। মাঠেতে প্রচুর ফসফরাস থাকা সত্ত্বেও গাছ তাহা আর গ্রহণ করতে পারে না। চুণের আর একটা কাজ আছে। চুণ মাটিতে দিলে pH বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ অম্লতা হ্রাস পায়। এরই ফলে মাটির নীচে যে ফসফরাস জাতীয় সার আছে সেগুলি উপরে উঠে আসে। ফলে মাটির নিম্নস্তরে অবস্থিত লৌহ ও এলুমিনামের সঙ্গে কোন ক্রিয়া করতে পারে না।

যে মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশী সেখানে এই সার দিয়ে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি মাঠে লাঙ্গল দিবার সময় চুণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় তবে তার থেকে বিশেষ ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এই সমস্ত মাঠে চুণ ও ফসফরাস যোগ করা অন্ততঃ বীজবপন কোরবার ২০ দিন আগে হলে ভাল হয়, যেন মাটিতে ফসফরাস রাসায়নিক ক্রিয়া করে গাছের উপযোগী হয়ে থাকে। কারণ ফসফেট এদের সঙ্গে মিশে ক্রিয়া করতে সময় নেয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় লাল কাঁকরে মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে মৃৎবিজ্ঞানীরা ল্যাটা-রাইট নামে অভিহিত করেছেন। এই মাটিতে অন্য মাটির থেকে লৌহের অংশ বেশী। ১·৫% থেকে অনেক সময় ৫ পর্য্যন্ত। সুতরাং এতে যদি কোন ফসফরাস জাতীয় সার দেওয়া হয় তবে এর থেকে যে লৌহজাত মিশ্র পদার্থ তৈরী হবে উহা সহজে গাছের গ্রহণযোগ্য হবে না। এগুলি সাধারণতঃ জলে দ্রবনীয় হয়। তবে সেই মাটিতে যদি অম্লতা একটু বেশী হয় (অন্ততঃ pH ৪ ইউনিট) তবে দ্রবনীয় হইতে পারে। এই মাটিতে ক্যালসিয়াম খুব কম। সুতরাং ফসফেট ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিশতে পারে না ও গাছের গ্রহণযোগ্য হয় না।

এর ফলে মাঠে চুণ দিয়ে যদি ফসফেট সার ছড়ান যায় তবে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সবথেকে তাড়াতাড়ি ফসফরাস মিশতে পারে সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের সহিত মিশে।

ফসফরাস সার মাটিতে মিশতে বেশ সময় লাগে। তা বাদে এই সারের যে অংশ মাটির সংস্পর্শে আসে না সে অংশ অবিকৃত রয়ে যায়। সুতরাং এই সার যদি খুব ভাল করে গুঁড়া করে মাটিতে ছড়ান যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাটির উপরও এর কাজ অনেকটা নির্ভর করে। অনেক সময় অন্য সারের সঙ্গে মিশিয়ে মাঠে ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। সবথেকে ভাল হয় যদি পরিমাণ মত ফসফেট আবর্জ্জনা সারের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে ছড়ান যায়।

সারের উপর কিছু মাটি দিয়ে তবে বীজ দেওয়া উচিত। কারণ ফসফেটই হউক আর হাড্ডি সারই হউক এদের মাটিতে মিশতে সময় লাগে। সব থেকে ভাল হয় যদি এই সার মাটিতে দেওয়ার আগে খুব ভাল করে গুঁড়া করে নেওয়া হয়।

প্রাণীদের হাড়েতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। সুতরাং যে সমস্ত পশু প্রতিপালন করে বিক্রী করা হয় তাদের মধ্য দিয়ে বহু ফসফরাস বাইরে চলে যায়, একটা ১০০০ পাঃ ওজনের গরুর দেহে অন্ততঃ ৭ পাঃ ফসফরাস পাওয়া যায়। ১০,০০০ পাঃ দুধে প্রায় ১১ পাঃ ফসফরাস থাকে। যদি কোন কৃষক কেবলমাত্র পশু প্রতি-পালন করে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করেন তবে তিনি পরোক্ষভাবে মাটির ফসফরাস নষ্ট করবেন। প্রথম ২।১ বৎসরে এর কোন ফল দেখা যায় না। পরে এই জমিতে উৎপন্ন শস্যে এর অভাবের ছাপ পড়ে। ক্ষেতের উৎপন্ন শস্যে যে পশু পালন করা হয় তাদের দেহেতে

এর অভাবের ছাপ পড়ে। ফসলের সঙ্গে মাঠ থেকে কিছু ফস-
ফরাস চলে যায়, যদি এক একর জমিতে ১৮ টন লুসার্ণ ফসল হয়
তবে এই গাছের মাধ্যমে সেই মাঠ থেকে ১৮ পাঃ ফসফরাস
গাছে টেনে নেবে তারপর ঐ ফসল মাঠ থেকে তুলে নিলে ঐ পরিমাণ
ফসফেট মাঠ থেকে চলে যাবে। এর আংশিক ক্ষতি মিটান যায়
যদি পশু প্রতিপালন করবার সময় গোময় ও আবর্জ্জনা (লুসার্ণ গাছ)
মিশিয়ে আবর্জ্জনা সার তৈরী করে ঐ মাঠে আবার দেওয়া যায়।

গাছের ফসফরাস জাতীয় সারের প্রয়োজনের স্থান নাইট্রোজেন
জাতীয় সারের ঠিক পরেই। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নাইট্রোজেন
জাতীয় সার। এর ৫ ভাগের কিম্বা ১০ ভাগের এক ভাগ অংশ
ফসফরাসের প্রয়োজন হয় গাছের বৃদ্ধির জন্য কিম্বা ফুল ও ফলের
উৎপাদনের জন্য। যদি জমিতে এই জাতীয় সার কম থাকে তবে
গাছ মাটিতে তাড়াতাড়ি শিকড় গজাতে পারে না। মাটির মধ্যে
ফসফরাসের একটী প্রধান কাজ গাছের শিকড় বৃদ্ধি করা। ফলে গাছ
বেঁটে হয়ে যায়। পরিমাণ মত নাইট্রোজেন পেয়ে গাছের উদ্ভিজ্জ
পাতা লতা বাড়ে কিন্তু গাছ উঁচু হয় না। গাছের প্রধান কাণ্ড ও
পেটিতলগুলি হরিদ্রাভ রঙ ধারণ করে। ফুলের জন্য মাটিতে জান্তব
সারের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। লন ও ঘাসের জন্য খেলার মাঠে
ও উঠানে এর ব্যবহার সুনিশ্চিত। অনেক সময় দেখা গেছে লাল
মাটিতে লেবু জাতীয় গাছ অনেক বড় হয়ে গেছে অথচ ভাল ফল হয়
না। গর্ত্ত করে এই ফসফরাস জাতীয় সার দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

ফসফরাস জাতীয় সারের মধ্যে বিশেষ প্রচলন হয়েছে সুসার-
ফসফেটের। সুপার ফসফেট তিন রকমের। একক সুপার ফসফেটে
(Single), দ্বিগুণ সুপার ফসফেট (Double) ও তিন গুণ সুপার

ফসফেট (Trible)। যে কোন সুপার ফসফেট সারে এই তিনটীই পাওয়া যায়। যেটির পরিমাণ সব থেকে বেশী থাকে সেইটীর নাম দিয়ে বাজারে বিক্রী হয়। ফসফেট একটী রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ। ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চূণ জাতীয় পদার্থ ও ফসফেট মিশ্রণে তৈরী। রাসায়নিক ফরমুলাতে বলা যায় $Ca_3(PO_4)_2$। এর মধ্যে যখন একটী হাইড্রোজেন আসে ও একটী ক্যালসিয়ম পরমাণু স্থানচ্যুত হয় তখন তাকে বলে ডাই ক্যালসিয়ম ফসফেট $Ca_2H(PO^4)_2$। যখন আরও একটী হাইড্রোজেন পরমাণু-এর মধ্যে ঢোকে ও আর একটী ক্যালসিয়ম পরমাণুকে স্থানচ্যুত করে তখন একে বলে ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট।

যে পাথরে ক্যালসিয়ম ফসফেট বেশী থাকে সেই পাথর সংগ্রহ করে গুঁড়া করা হয়। পরে এতে সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে ভাল করে মিশান হয়। ২৪ ঘণ্টা ধরে ঐ ক্রিয়াটী চলে। পরে থলি ভর্ত্তি করে গুদামে ফেলে রাখা হয়। কিছু দিন পরে এগুলিকে বাজারে বিক্রীর জন্য পাঠান হয়।

দ্বিগুণ সুপার ফসফেটে P_2O_5 থাকে ৩২%–৩৮%। এতে মনো-ক্যালসিয়ামের ভাগ কমে যায় ও ডাই ক্যালসিয়াম এর সব থেকে বেশী, তিনগুণ সুপার ফসফেটে মনো ও ডাই কমে যায় ট্রিপল থাকে সব থেকে বেশী। এই তিন জাতীয় ফসফেটের মধ্যে একক সুপার ফসফেট বেশী কাজ দেয়। কারণ এদের কণাগুলি খুব ছোট, ফলে অতি তাড়া-তাড়ি, অন্ততঃ ১০ দিন এর মধ্যে এরা মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু ডাই ও ট্রাই-এর মিশতে বেশ সময় লাগে ও উপযুক্ত মাটির অভ্যন্তরে বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন হয়। এর ফলে মাটিতে এই সার দেওয়া হলে তৃতীয় বৎসরে গিয়ে এর ফল পাওয়া যায়।

একক সুপার ফসফেটে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি থাকে।

মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট—	শতকরা ৩৬
ডাই " " "	" ৩
ট্রাই " " "	" ৩
ক্যালসিয়াম ফসফেট বা জিপসাম	" ৫১
জলীয় পদার্থ—	" ৬
সিলিকা—	" ৭
লৌহ ও এলুমিনাম সালফেট—	" ৪

বাজারে চলতি বিভিন্ন ফসফেট জাতীয় সার, তাহাতে ফসফরাসের অবস্থিতির পরিমাণ ও মাটির সঙ্গে তাদের ক্রিয়ার ফলাফলের একটী তালিকা দেওয়া গেল।

ফসফরাস জাতীয় সার	P_2O_5 অবস্থিতি	মাটির সহিত ক্রিয়ার ফল
একক সুপার ফসফেট—	১৪—২০%	নিরপেক্ষ।
দ্বিগুণ সুপার ফসফেট—	৩৮—৪৪%	অম্লতার দিকে
তিনগুণ সুপার ফসফেট—	৪৫—৪৬%	"
এমোনিয়াম ফসফেট—	৩৫—৪০%	ক্ষারের দিকে
হাড্ডি সার—	২০—২৫%	"
হাড্ডি গুঁড়া (জ্বালান)	২৫—৩৮%	"
পাখির বিষ্ঠা—	১২—২৬%	"
বেসিক শ্লাগ—	৬—২৫%	"

এদের মধ্যে যে দেশে যে জিনিযটী বেশী পাওয়া যায় সেখানে সেটির প্রচলন বেশী। ইউরোপে যে মাটি থেকে লৌহ তৈরী হয় সে মাটিতে ফসফরাস বেশী। সুতরাং সেই দেশে এই বেসিগ শ্লাগ সার হিসেবে বেশী ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় প্রচুর পাথুরে ফসফেট পাওয়া

যায় ফলে সে দেশে ফসফরাস সারের মধ্যে সুপার ফসফেটের প্রচলন বেশী। আমাদের দেশে এর কোনটাই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না। তবে চেষ্টা করলে মৃত প্রাণীদের দেহ থেকে হাড় পাওয়া যায় বহু পরিমাণে। সেই হাড় থেকে বহু হাড্ডি সার তৈরী হতে পারে। তবে সেকালে ধর্ম্মের নামে ছোয়াছুয়ির ব্যাপার থাকায় বহুদিন এই হাড়গুলো ভাগাড়ে পড়ে ছিল। সুখের বিষয় আজ আর সেভাবে হাড়গুলো নষ্ট হচ্ছে না। এগুলিকে নানা স্থান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে এ থেকে হাড্ডি সার বানানো হচ্ছে।

মাঠেতে এমোনিয়াম ফসফেট দিয়ে মাঠেতে নাইট্রোজেন ও ফস-ফরাস এই দুই জাতীয় সার মাঠেতে দেওয়া হয়। সুতরাং এর চাহিদা বেশী হওয়া উচিত। আমাদের দেশের কৃষকেরা মাঠেতে ঠিক এই সার না দিলেও মিশ্রসার (এমোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেট) মাঠে ছড়িয়ে ভাল ফল পেয়েছেন।

হাড্ডিসার—আমাদের দেশে হাড্ডি সারের প্রচলন হয়েছে। বিশেষত যাঁরা ফুল ও ফলের বাগান করেন তাঁরা এর ব্যবস্থার সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়েছেন। সাধারণতঃ হাড্ডি সারে P_2O_5 থাকে শতকরা ২০-২২%। কিন্তু হাড় গুঁড়া কোরবার আগে ভাল করে পরিষ্কার না করে নিলে P_2O_5 এর অংশ কমে ১৩।১৪% আসতে পারে। তবে যদি আগুনে সিদ্ধ করে নেওয়া যায় তবে খুব ভাল ভল পাওয়া যায়। কারণ তাতে দেখা যায় যে P_2O_5 এর অংশ ২৮% পর্য্যন্ত হয়। এছাড়া এই হাড্ডি সারে শতকরা ৩-৫% নাইট্রোজেন থাকে। এই সারে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। যে মাটিতে অম্লতা একটু বেশী অর্থাৎ pH ইউনিট ৫-৬ এর মধ্যে সেখানে এই সার দিয়ে ভাল ধানের ফসল পাওয়া যায়।

ফসফরাস সারটিকে কেবলমাত্র ইংরাজী "পি" অক্ষরটি দিয়ে বুঝান হয় না। সাধারণতঃ P_2O_5 লেখা হয়। কিন্তু বলার সময় বলা হয় ফসফরিক এসিড।

আমাদের দেশের গরু, বাছুর, ঘোড়া, প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মারা গেলে কোন ভাগাড়ে বা নদীর কিনারে ফেলে দিয়ে আসা হয়। এদেরই হাড় থেকে হাড্ডি সার তৈরী হয়। হাড্ডি সারে যেটুকু ফসফরিক এসিড থাকে তার প্রায় সবটি গাছ পেতে পারবে মাটি থেকে। আরও ভাল হয় যদি গুঁড়া কোরবার পর এতে একটু পরিমাণ মত সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে দেওয়া যায়।

বেসিগ শ্লাস—যে মাটি থেকে লোহের কারখানায় লৌহ তৈরী করা হয় সেই মাটিতে কিছু পরিমাণে ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস অতি কষ্টে লৌহ থেকে দূরীভূত করতে হয়। নানা প্রকার পদার্থের সঙ্গে মিশে এই ফসফরাস লৌহের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। একেই বলা হয় বেসিগ শ্লাগ। আমাদের দেশে টাটার কারখানাতে বা কুলটী লৌহের কারখানায় যে বেসিগ শ্লাগ পাওয়া যায় তাতে ফসফরাসের পরিমাণ খুবই কম, শতকরা ৩ ভাগেরও কম।

কারখানাতে এগুলি পাওয়া যায় খুব গরম অবস্থায়। একে ঠাণ্ডা করে গুঁড়া করলে তবে সারের উপযোগী হয়। খুব সূক্ষ্ম করে গুঁড়া করলে এদিয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায়। এতে ক্যালসিয়াম সালফেট থাকে বেশী পরিমাণে। তার ফলে লোণা মাটিতে দিয়ে দেখা গেছে এর ক্ষারত্ব নষ্ট করতে পারে।

মাটিতে ফসফরাস-এর প্রধান কাজ

(১) অতি সত্বর গাছের বৃদ্ধি হয় ও তাড়াতাড়ি ফল পাকে।

যে গাছের ফল পাকতে ফুল ফোটার পরে ২ মাস সময় লাগে ফসফরাসের প্রভাবে মাত্র ১ মাসের মধ্যে সে ফল পেকে যাবে।

(২) গাছের শিকড় মাটির নীচে সম্যক বৃদ্ধি পায়।

(৩) ধান্য ইত্যাদি গাছের যাদের গোড়া থেকে (ফাকড়া) tillering বার হয় তাদের এগুলি বার হতে সাহায্য করে।

(৪) শস্যেতে ফসফরাস এর অংশ বাড়ে।

(৫) মাটিতে ফসফরাস পরিমাণ মত থাকায় গাছ খুব বেশী নাইট্রোজেন টানতে পারে না।

(৬) ফসল বা ফল হয় খুব পরিপুষ্ট ও উন্নত ধরণের।

মাটিতে গ্রহণযোগ্য ফসফরাসের অভাবে বিভিন্ন রোগ।

নাইট্রোজেন অভাবে গাছের রোগ ফসফরাসের অভাবে গাছের রোগের মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ভিন্ন, ভিন্ন গাছের ভিন্ন চিহ্ন ফুটে উঠে।

(১) গাছের দেহেতে যে কোষ থাকে তার মধ্যে প্রোটাপ্লাজম থাকে। এই প্রোটোপ্লাজম এ থাকে কিছু ফসফরাস। যদি সেই ফসফরাসএর অভাব পড়ে তবে গাছের কোষ বিভক্তিকরণ ভাল হয় না। এর ফলে গাছ বেঁটে হয়ে যায়।

(২) ফসফরাস অভাবে গাছের প্রধান কাণ্ড ও পেটিগুলি হরিদ্রাভ হয়।

(৩) গাছের দেহেতে শর্করা উৎপত্তির সঙ্গে ফসফরাসএর কোন নিবিড় সম্বন্ধ নেই। কিন্তু যে গাছের দেহে ফসফরাসএর অভাবে সে গাছে সেলুলোজ ও ষ্টার্চ কম তৈরী হয়।

(৪) ফসফরাসএর অভাবে এমাইনো এসিড কম তৈরী হবে ফলে প্রোটিন কমে যাবে।

মাটিতে যে সুপার ফসফেট দেওয়া হোক না কেন এতে তিন রকমের সুপার ফসফেট থাকে। কিন্তু তিনটী সুপার ফসফেট এক, অবস্থায় থাকে না। মাটিতে গেলে পর মনোক্যালসিয়াম ফসফেট অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে প্রথমেই চেষ্টা করে ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেটে পরিবর্ত্তিত হতে। আবার ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট চেষ্টা করে ডাই ক্যালসিয়ামএ পরিবর্ত্তিত হতে।

$$Ca_3 (PO_4)_2 + CaH_2 (PO_4)_2 = 2Ca_2H (PO_4)_2$$
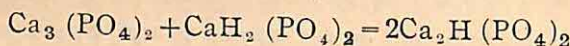
মাটিতে ফসফরাসের অবস্থান।

পৃথিবী মেরু প্রদেশ থেকে যদি ক্রমশঃ বিষুব রেখার দিকে যাওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে মাটিতে ক্রমশঃ ফসফরাসএর পরিমাণ বাড়ছে। তাই দেখা যায় সরলবর্ষীয় অঞ্চলের মাটিতে ফসফরাসএর পরিমাণ মেরুপ্রদেশের মাটিতে অবস্থিত ফসফরাসএর থেকে পরিমাণ বেশী। কিন্তু সেখানকার দিনের আলোর স্থায়িত্ব বেশী হওয়ায় গাছ শীঘ্র ফল দেয় বা সে ফুল ও ফসল সত্বর পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার মাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মাটি থেকে বিভিন্ন ও এই মাটিতে যে ফসফরাস আছে সেটা প্রায় সবসময়ই গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আছে।

পটাসিয়াম

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে পাথর থেকে মাটির সৃষ্টি। এই পাথরের মধ্যে যে সমস্ত অর্থক্লেজ, মাইক্রোকেলাইন, বাইয়োটাইট ও মাস্কোভাইট প্রভৃতি পাথরে পটাসিয়াম বিভিন্ন আকারে থাকে। পাথরগুলো বিভিন্ন নৈসর্গিক প্রক্রিয়াতে ক্ষয় পায় তখন পাথর থেকে পটাস বেরিয়ে আসে এবং জলের সহিত মাটি থেকে চলে যায়। অবশ্য কিছু অংশ মাটিতে থেকে যায়। সেই পড়ে থাকা অংশ থেকে গাছ পটাস সংগ্রহ করে।

দেখা যায় যে গড়পড়তায় আগ্নেয়শিলাতে ২·৬% পটাস আছে। কিন্তু স্যাণ্ডস্টোনে এর দশমাংশ মাত্র। এক একর জমিতে ৩০,০০০ পা পটাসিয়াম থাকে। অবশ্য অল্প বিস্তর কম বেশী সব সময়ই হয়। ৮" ইঞ্চি মাটির নীচে প্রায় সব মাটিতে পটাস বেশী থাকে। আমরা যে বালুকণা চারিদিকে দেখি এগুলি তৈরী হয়েছে কোয়ার্টজ থেকে। এর ফলে এই বালুকণাতে পটাসের পরিমাণ খুব কম। পীট বা কাদাবহুল মাটিতে পটাস থাকে। কারণ উৎপত্তি সময়ে বেশীর ভাগ পটাশ মাটি থেকে চলে যায়। যে অঞ্চলে খুব কম বৃষ্টি হয় সে অঞ্চলে মাটি থেকে পটাস খুব কমই চলে যায়। ফলে সেখানে পটাশের পরিমাণ বেশী।

মাটিতে যে পটাশ থাকে সে পটাশ সহজেই গাছের গ্রহণযোগ্য হয় না। মাটিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চলার সাথে সাথে এর পরিমাণ বাড়ে। কেবলমাত্র কার্বন জাতীয় পদার্থ বা সবুজ সার মাঠে দিয়ে

আর আবর্জ্জনা সার দিয়ে মাটির এই পটাশ ক্ষয় পূরণ করা যায়। কারণ সবুজ সার আর আবর্জ্জনা সারেতে যে পটাশ থাকে সেটা মাটিতে নির্গত হয়। পরে পাকের রসের সহিত দেহেতে আসে। গাছের দেহ ও লতাপাতা পচে যে কার্বনিক এসিড তৈরী হয় সেই এসিড মাটি থেকে আরও পটাশ টেনে আনতে সমর্থ হয়। গাছের মাধ্যমে মাটিতে যে পটাশ ক্ষয় হয় সেটা এভাবে পূরণ করা যেতে পারে।

পটাশিয়াম সাধারণতঃ মাটির 'B' স্তরে কিম্বা ৮" নীচে বেশী থাকে। কারণ যে মাটি যত হাল্কা সে মাটিতে তত পটাশিয়াম কম। যে যত ভারী সে মাটিতে তত পটাশিয়াম বেশী। মাটির নীচের স্তরে বেশী কাদামাটি থাকে। তার ফলে এই অংশে পটাশিয়ামও বেশী থাকে। জলের সহিত সহজ দ্রবনীয় অন্যান্য পদার্থ ও পটাশিয়াম কৈষিকার্ষণে মাটির উপরিস্তরে আসে। সাধারণতঃ মাটির উপরিস্তরে পটাশিয়াম খুব কমই থাকে। ১০০ গ্রাম মাটিতে ১ থেকে ২০মিঃ ইকুইভ্যালেণ্ট পরিমাণ থাকে। এই পরিমাণ নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে এক একর মাটিতে ১৫৬৪ থেকে ১৫৬৪০ পাউণ্ড পটাশ আছে। মাটির মধ্যে যে সমস্ত সহজ পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ আছে তার মধ্যে পটাশ সব থেকে কম পরিমাণ থাকে।

আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি পটাশে গাছের কি প্রয়োজন কারণ পটাস দিয়ে গাছে কোন পদার্থ গড়ে ওঠে না। অথচ পরীক্ষা করে দেখা যায় গাছের বৃদ্ধির জন্য পটাশের প্রয়োজন। গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে পটাশ টেনে বের করে। এই টেনে নেওয়া পটাশ গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জুড়ে বিরাজ করে। পরে যখন ঐ গাছ কেটে নেওয়া হয় তখন এই গাছের মাধ্যমে

পটাশ মাঠ থেকে চলে যায়। বছরের পর বছর মাঠের পটাশ এভাবে ক্ষয় হচ্ছে। অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে মাঠে পটাশ না যোগ করলে মাঠে পটাশের হ্রাস হবে এবং গাছের দেহেতে পটাশের অভাব ফুটে উঠবে।

মাটিতে পটাশের অবস্থিতি সত্যই রহস্যজনক। গাছের অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ নয় বলে বিজ্ঞানী সমাজে বিবেচিত অথচ এর প্রয়োজন আছে। অন্যান্য কোন ধাতব পদার্থের সহিত মিশে মিশ্র আকারে থাকাই এর স্বভাব। এর মধ্যে কিছুটা পটাসিয়াম থাকে যারা খুব তাড়াতাড়ি কোন অম্লজাতীয় পদার্থের সহিত মিশতে পারে বা অন্য কোন পদার্থ কোন মিশ্র পদার্থকে অতি সহজে বার করে নিতে পারে। গাছ কেবল এই বাইরে টেনে আনা অংশটুকু গ্রহণ করতে পারে।

যে মাটিতে ধাতব পদার্থ নির্গত করার ক্ষমতা মধ্যে (Exchange Capacity) শতকরা ১৫ ভাগ ক্যালসিয়াম, ২০ ভাগ হাইড্রোজেন, ১০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম ও ৫ ভাগ পটাসিয়াম থাকে সেই মাটিকে সাধারণতঃ ভাল মাটি বা গাছ উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী থাকে। এই হিসাবে দেখা যায় যে লাঙ্গলের ফলা মাটির যতটা নীচে যায় ততটা গর্ত্ত নিয়ে এক একর জমিতে ৩৯১ পাঃ পটাসিয়াম থাকে। আর্দ্র অঞ্চলে লাল মিশ্র ধাতব পদার্থ থেকে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম যখন চলে যায় তখন মাটির ক্ষুদ্রতম যৌগিক পদার্থে (Soil complex) এ ধাতব পদার্থের শূন্য স্থান পূরণ কোরবার জন্য হাইড্রোজেন ছুটে আসে এবং অন্যান্য অম্লজাতীয় পদার্থের সহিত মিশে এসিডের সৃষ্টি করে। ইহাতে জমির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। যদি মাটিতে চূণ যোগ করা যায় তবে চূণ থেকে ক্যালসিয়াম এসে হাইড্রোজেনের স্থান গ্রহণ করে। ঠিক এর পরে যদি মাঠে পটাশ যোগ

করা যায় তবে পটাসিয়াম ক্যালসিয়ামকে সরিয়ে দেবে এবং সেখানে নিজে বসে যাবে।

মাটিতে পটাশ জাতীয় সার দিলে মাটি যত সত্বর সেগুলি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করতে পারে, গাছের বা অন্য কোন কাজের জন্য ঠিক তত তাড়াতাড়ি মিশ্রযৌগিক কাদামাটির (soil complex) এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে না। বার হয়ে আসে খুব ধীরে। মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে পটাস দিলে এই পটাস ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাদামাটির যে পরমাণু থাকে তার ঠিক মধ্যস্থলে গিয়ে স্থান করে লয়। তার উপরে ছড়িয়ে থাকে অন্যান্য পরমাণুগুলি। মণ্টমরিলোনাইট কাদামাটির পরমাণুতে পটাসিয়াম ঠিক কেন্দ্রে গিয়ে ঠাঁই করে নেয় এবং অন্যান্য পরমাণুগুলি একে ঘিরে বসে থাকে তার ফলে তাকে এই পরমাণু ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে। কিন্তু শস্যের মাধ্যমে, কিম্বা গাছের ডাঁটা বা লতাপাতার মাধ্যমে বা কৈসিকার্ষণে পটাস উপরে এলে বা কাদা মাটি থেকে চলে গেলে পটাস অতি সহজেই গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। খুব সম্ভবতঃ মাটির উপরে পটাস হ্রাস পেলে মাটির 'B' স্তরে যে পটাস থাকে মাটি সে পটাশ ছেড়ে দেয়।

মাটিতে পটাসিয়াম নিরুপণের বহু পদ্ধতি বেরিয়েছে। তার মধ্যে এমোনিয়াম এসিটেট দিয়ে মাটি ভাল করে নাড়লে সবটা না হোক অন্ততঃ বেশীর ভাগ পটাস বেরিয়ে আসে। এ ভিন্ন সোডিয়াম এসিটেট দিয়েও অনেক স্থানে মাটি থেকে এগুলো বার করার রীতি আছে। অবশ্য এ ভাবে সমস্ত পটাসিয়াম মাটি থেকে টেনে আনা যায় না। সূক্ষ্ম কাদামাটির পরমাণুর মধ্যে যে পটাসিয়াম থাকে তাকে বার করতে গেলে দরকার হয় নইট্রিক এসিড দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া।

ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এই তিনটী পদার্থকে মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য মাটিতে সব কিছুই থাকে। কিন্তু এই তিনটীর অবস্থানের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। যদি ফসলোৎ-পাদনের পূর্ব্বে কোন জমিতে এই তিনটী পরিমাণ মত দেওয়া যায় তবে দেখা যায় ফসল উৎপাদনের পর মাটিতে পটাসিয়াম কমে গেছে এবং ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বেড়ে গেছে।

আবর্জ্জনা সারের মধ্য দিয়ে বেশী পটাশ জাতীয় সার পাওয়া যায়। কারণ গাছের লতা পাতায় যে সমস্ত থাকে সেগুলি একটুও নষ্ট হয় না। তার সমস্তটাই পাওয়া যায়। গাছ ও লতা পাতা পুড়িয়ে যদি মাঠে দেওয়া যায় তবে সব পটাশ মাঠে গিয়ে পড়বে। গম জাতীয় গাছের ডাঁটাতে এক টনে ১৬ পাঃ পটাশ পাওয়া যায়। গোবরে ও গোমুত্রে এক টনে ৮ পাঃ পটাশ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গাছের ফলে ও ফসলে বেশী পরিমাণে পটাশ থাকে। সুতরাং বীজ থেকে তৈরী যে কোন তৈল বীজ জাতীয় সারে বা খইলে বেশী পটাস থাকে। গমের বীজে প্রতি টনে ১৫ পাঃ, তুলা বীজে টনে ৩০ পাঃ ও সোয়াবীনে টনে ৪০ পাঃ পর্য্যন্ত পটাশ পাওয়া যায়।

সব মাটিতে গাছের উপযোগী গ্রহণযোগ্য পটাশ সব সময়ই অল্পবিস্তর থাকে। অন্ততঃ অঙ্কুরোদ্গম হয়ে গাছের বড় না হওয়া পর্য্যন্ত যে পরিমাণ পটাসিয়াম দরকার হয় সে পরিমাণ পটাসিয়াম সব সময়ই থাকে। মাটিতে যে পটাশ থাকে সেটা অনেক সময় জলের সঙ্গে মিশে বাইরে চলে যায়। পটাশ সার মাঠেতে কম পড়লে তার লক্ষণ প্রথমে ফুটে উঠে গাছের পাতায়। প্রথমেই গাছের পাতার শিরার মধ্যকার স্থানে ছোট ছোট ফুটা হয়। এ দিয়ে বোঝা যায় গাছ মাটি থেকে পুরামাত্রায় পটাস পাচ্ছে না। কলাগাছের পাতা

ঈষৎ লালচে হরিদ্রাভ রঙ ধারণ করে। আলুগাছের পাতা বেঁকে যায়। আর ভুট্টা গাছের পাতা সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলে। দুই উপশিরার মধ্যবর্ত্তী স্থান শুকিয়ে যায়।

পাথুরে পটাস

পাথরে পটাস থাকে। যেমন কার্ণালাইট। কার্ণালাইট পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রণে তৈরী একটী মিশ্র পদার্থ; (Kcl, $MgSO_4$ $3H_2O$) এতে শতকরা ২৭ ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরাইড থাকে। সোজাসুজি এটাকে গুঁড়া করে মাঠে দেওয়া যায় না। এই পদার্থে পটাসিয়াম ক্লোরাইড রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাড়িয়ে শতকরা ৮০ ভাগে পরিণত করা হয়। বারবার ভাল ভাবে গুঁড়া করে মাঠেতে ফেলা হয়। লাই নাইট তৈরী হয় পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সহযোগে। (Kcl, Mg SO_4, $3H_2O$) এই সার গুঁড়া করে মাঠেতে শস্য রোপণের বহু পূর্ব্বে জমিতে দেওয়া উচিত। যদি বীজের সংস্পর্শে পটাসিয়াম ক্লোরাইড আসে তবে বীজটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই জাতীয় সারের মধ্যে পলিহেলাইটে পটাস ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ম তিনটীই থাকে। এই সব পাথর থেকে পাওয়া সব সারগুলি অল্প বিস্তর রঙ্গীন।

উপরে যে কয়টী সার জাতীয় পদার্থের নাম দেওয়া গেলে এর সব কয়টার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে পটাস থাকে। এর মধ্যে সিলভাইটে থাকে শতকরা ৬৩ ভাগ; কার্ণালাইটে থাকে ১৭ ভাগ, কাইলাইটে থাকে ১২% পলিহেলাইটে থাকে ১৫%। এদেরকে পাথর থেকে সংগ্রহ করে গুঁড়া করে তখনই মাটিতে দেওয়া। সম্পূর্ণ নির্ভর করে যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে মাঠের দূরত্বের উপর।

পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড বা মরিয়েট অব পটাস সালফেট অব পটাস

মাঠেতে এই সার দিলে কেবলমাত্র মাঠে দুটী জিনিষ দেওয়া হয়। পটাসিয়াম ও ক্লোরিণ। সোজাসুজি অন্য কোন জিনিষের সহিত না মিশিয়ে কেবলমাত্র একটীকে মাঠে দেওয়া যেতে পারে। এ ভিন্ন অন্য ফসফরাস ও নাইট্রোজেন জাতীয় সারের সহিত মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে শতকরা ৫০—৬০ ভাগ পটাস থাকে। আমাদের দেশে এই সার বেশী পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের মাটিতে পটাসের অভাব পুরা মাত্রায় দেখা যায় নি।

বাজারে যে সমস্ত সালফেট অব পটাস পাওয়া যায় তার অধিকাংশই তৈরী হয় পটাসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে। এতে একটু বেশী খরচ পড়া স্বাভাবিক। সেজন্য কৃষকদিগকে মাঠে এই সার ছড়াবার জন্য বলা যায় না। পৃথিবীতে যে যে অঞ্চলে তামাক চাষ হয় যেমন ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড (আমেরিকা), অন্ধ্র, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানের মাটিতে যদি সালফেট অব পটাস দেওয়া যায় তবে ভাল তামাক পাওয়া যেতে পারে।

পটাসিয়াম ও পটাসের মধ্যে তফাৎ হলো রাসায়নিক ধাতব পদার্থকে বলে পটাসিয়াম এবং পটাসিয়াম অক্সাইডকে বলা হয় পটাস। অবশ্য এর ব্যবহারে কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

পটাস সারের প্রয়োজনীয়তা

(১) দেখা গিয়েছে গাছের পাতায় পটাশ থেকে বায়ু থেকে অঙ্গার বা কার্বণডায়া অকসাইড (Co_2) টেনে নিতে সাহায্য করে।

(২) শস্যকণার মধ্যে (grain) পটাস থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করতে সাহায্য করে।

(৩) যেখানে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম এর অভাব হয় সেখানে প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে।

(৪) গাছকে স্বাস্থ্যবান ও সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। এর প্রভাবে গাছ বল পায় ও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

পটাস বিহনে গাছের বিভিন্ন রোগ

পটাস গাছের কোন বিশেষ অংশের সৃষ্টি করে না। প্রোটিন, ক্লোরোফিল, তৈল জাতীয় পদার্থ বা শর্করা জাতীয় পদার্থ-এর কোনটার মধ্যে পটাস পাওয়া যায় না। অথচ এর প্রয়োজন আছে গাছের সর্ব্বাঙ্গে অল্প বিস্তর পটাস পাওয়া যায়। গাছের পাতায় এদের প্রাধান্য থাকে। খুব সম্ভব গাছের দেহেতে যতটা পটাশ থাকে তার সবটা দ্রবণীয়।

পটাসিয়া উপস্থিতিতে শর্করা ও প্রোটিন তৈরীর সুবিধা হয়। কোষের মধ্যকার জলীয় অংশের কম বেশী রক্ষা করে। অনেক সময় ক্যাটালিষ্টের (বর্দ্ধক) এর কাজ করে। সবার উপরে পটাসিয়াম অতি সহজে রেডিও-এ্যকটিভ হতে পারে ও ফলে ফটোসিনথিসিস-এর সুবিধা করে।

গাছের মধ্যে আলু, ধান ও ফলের গাছের পটাস বেশী প্রয়োজন হয়। পটাসের অভাব এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। অনেক সময় মাঠেতে কয়েক হাজার পাউণ্ড পটাস থাকলেও সেটা গাছের প্রাপ্তি যোগ্য অবস্থায় থাকে না। পটাসিয়াম-এর আর একটী প্রধান কাজ গাছকে রোগ থেকে দূরে রাখা।

(১) পটাস বিহনে গাছের ফ্যাকড়া কমে যায় (tillering)। (২) গাছের ফসল কমে যায়। (৩) গাছের পাতার সীমারেখা অনেক সময় তামাটে হয়ে পড়ে। (৪) অনেক সময় পাতা থেকে বেশী জল বেরিয়ে গিয়ে ক্লোরোসিসের সম্ভাবনা থাকে।

ম্যাগনেসিয়াম

নানাজাতীয় পাথরের মধ্যে চুণা পাথরে সব থেকে বেশী ম্যাগনেসিয়াম থাকে। চুণাপাথরে ম্যাগনেসিয়াম থাকে প্রায় শতকরা ৫ ভাগ, আগ্নেয়শিলাতে শতকরা ২'১ ভাগ, সেলএ থাকে ১'৫ ভাগ আর স্যাণ্ডষ্টোনে থাকে শতকরা ০'৭ ভাগ। পাথরের ভিতর এত বেশী পরিমাণে থাকলেও মাটিতে কিন্তু বেশী পরিমাণ থাকে না। কোন মাটিতে কয়েক ppm মাত্র আবার কোন মাটিতে শতকরা ১ ভাগও থাকে। কিন্তু সকল মাটিতেই ম্যাগনেসিয়াম কম বেশী থাকে। যে সব মাটির বেশী বয়স হয়েছে সে সব মাটিতে এর পরিমাণ বেশী থাকে। যখন জলের সহিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ক্রিয়া করে তখন সেই সমস্ত মৌলিক বা যৌগিক উপাদান থেকে ম্যাগনেসিয়াম নির্গত হয়। পরে জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে যায়। সমুদ্রের লোনা জলে অনেক সময় শতকরা ১৫ ভাগেরও উপর ম্যাগনেসিয়াম থাকে। সুতরাং লোনা মাটিতে অনেক সময় ৫ থেকে ১৫ ভাগ মিশ্র বা যৌগিক ম্যাগনেসিয়াম থাকে।

সুতরাং দেখা যায় জলে বা স্থলে ম্যাগনেসিয়ামের অবস্থিতি আদৌ কম নয় যদিও মাটির উপরিস্তরে অনেক সময় খুব কমই ম্যাগনেসিয়াম থাকে। গাছের পক্ষে ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা ঠিক পটাসিয়াম-এর পরেই কিন্তু অনেকটা ক্যালসিয়ামের কাজ চালাইয়ে দেয়। পডজল মাটির চেষ্টার লোম সিরিজে দেখা যায় যে নীচের স্তরে ক্যালসিয়াম কমতে থাকে এবং ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ যতই নীচে যাওয়া যায়

ততই বাড়তে থাকে। এই থেকে বলা যেতে পারে যে ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়ামের সম্পূরক। এ বাদেও ম্যাগনেসিয়ামের কাজ আছে।

গাছের ফলের মধ্যে বা ফসলের শস্যের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। ১০০ বুশেল ভুট্টার ফসলের মধ্যে ১৮ পা ম্যাগনেসিয়াম, ১০০ পা পটাসিয়াম ও ২৫ পা ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। গাছের ফলের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম থাকলেও এর দেহেতে বেশী ম্যাগনেসিয়াম থাকে না। মাটির মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম বেশী হোলে গাছের বা ফসলের কোন ক্ষতি করতে পারে না। গাছের যে ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে আজ কেউ অস্বীকার করবে না।

মাটির উপরিস্তরে যদি ম্যাগনেসিয়াম বেশী থাকে তবে গাছ তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে কিন্তু যে মাটিতে ম্যাগনেসিয়াম জলের সঙ্গে মিশে মাটির নীচে চলে গেছে সেখান থেকে গাছকে এই পদার্থ সংগ্রহ করতে সময় লাগে। কিন্তু মাটিতে যদি আবর্জ্জনা সার বা উদ্ভিজ্জ সার দেওয়া যায় তবে ঐ ম্যাগনেসিয়াম সহজেই গাছের গ্রহণ-যোগ্য হয়। বিভিন্ন বীজাণুর ক্রিয়ার মাধ্যমে যখন মাটিতে কার্বনিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড তৈরী হয় তারই ফলে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ থেকে ম্যাগনেসিয়াম নিষ্ক্রান্ত হয়।

দেখা গেছে যে তুটী সমান ওজনের একই জাতীয় গরুকে বিভিন্ন রকমের ঘাস খেতে দেওয়া হয় তবে যে গরু লুসার্ণ খেয়ে তুধ দেয় সেই তুধের মধ্যে বেশী মাত্রায় প্রোটিন ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। সাধারণতঃ একটী ১০০০ পাউণ্ড ওজনের গরুর দেহে মাত্র ½ পাউণ্ড ম্যাগনেসিয়াম থাকে। লুসার্ণএতে বেশী ম্যাগনেসিয়াম থাকে আর গরুর মুখ দিয়ে এই পদার্থটী বেশী মাত্রায় গরুর দেহেতে ঢোকে ও পরে তুধের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অনেক সময় দেখা যায় যে দোঁয়াশ মাটিতে যদি পটাসিয়ামের মাত্রা বেশী থাকে তবে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা কম থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর ফসলের পর যদি মাটি পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যায় যে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাই মাঠে যখন পটাশ সার দেওয়া হয় তখন ম্যাগনেসিয়াম সম্বন্ধে কৃষকক একটু সচেতন থাকলে ভাল হয়।

পৃথিবীর যে অংশে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সে অংশে নদীর জলে বেশী ম্যাগনেসিয়াম থাকে। আর যে অংশে কম বৃষ্টিপাত হয় সে অংশে নদীতে পূর্বাপেক্ষা কম ম্যাগনেসিয়াম থাকে। এ দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে জলের সঙ্গে মিশে প্রতিনিয়ত মাটি থেকে ম্যাগনেসিয়াম বার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যদি বৃষ্টির জল মাটির নীচে চুইয়ে যায় তবে জলের সঙ্গে কিছু ম্যাগনেসিয়াম মাটির তলদেশে চুইয়ে যাবে। এই ভাবে মাটিতে যে ম্যাগনেসিয়াম আসে তার বেশীর ভাগটা জমি থেকে চলে যাচ্ছে। এর ফলে মাটিতে গাছের গ্রহণোপযোগী ম্যাগনেসিয়াম কমে যাচ্ছে ফলে গাছের বাড় কমে যায়।

সাধারণতঃর গাছে সবুজ কণার মধ্যে (chlorophyll) ম্যাগনেসিয়াম থাকে। সুতরাং গাছের মধ্যে যদি ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হয় তবে প্রথম লক্ষণ দেখা যাবে গাছের পাতায়। ফলে গাছের পাতা হলদে হয়ে যাবে ও সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলবে। এটা অবশ্য আরও অনেক রকমে হতে পারে। অনেক সময় গাছের ডাঁটার মাঝখানে সাদা হয়ে যায়। তুলাগাছের পাতা ম্যাগমেসিয়াম বিহনে ঈষৎ রঙীন হয়ে পড়ে কিন্তু সোয়াবীনের পাতা হলদেটে হয়ে যায়।

যে মাটিতে আলু বীজ লাগান হয় সে মাটিতে বিশেষ যত্ন নেওয়া

উচিত। কারণ এই মাটির অম্লতা যদি ৫।৬ ইউনিটের উপর যায় তবে তাকে চুণ দিয়ে নিরপেক্ষ করা উচিত। কিন্তু আলু মোটেই চুণ সহ্য করতে পারে না। সেখানে এমন সার বা নিরপেক্ষকারক যোগ করা উচিত যাতে ম্যাগনেসিয়াম বেশী আছে। এতে আলুর বীজের কোন ক্ষতি হবে না। যদি ক্যালসিয়াম দিতেই হয় তবে কেবলমাত্র ক্যালসিয়ামই দেওয়া উচিত নয় কারণ ক্যালসিয়াম মাটির সংমিশ্রণ (soil complex) থেকে ম্যাগনেসিয়াম বার করে দেবে ও ম্যাগনেসিয়াম জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে যাবে। এই কারণে যেখানে কৃষক বছরের পর বছর একই ফসল চাষ করে সেখানে এর অভাব দেখা যায়। যে মাটিতে আলু উৎপন্ন হয় সেখানকার মাটিতে প্রায় একরে ৪৫ পাউণ্ড ম্যাগনেসিয়াম থাকে আর উৎপাদিত আলুর মাধ্যমে প্রায় এর শতকরা ৪০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম মাঠ থেকে চলে যায়।

ম্যাগনেসিয়াম সার

মাটির অম্লতার পরিমাণ কমাবার জন্য বা একে নিরপেক্ষ রেখায় নিয়ে আসার জন্য চুণের বদলে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করা হয়। এর জন্য ডলোমাইটিক (ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট) পাথর নিয়ে গুঁড়া করে মাঠে ছড়ান হয়। মাঠে যেখানে সালফেট জাতীয় সার দিলে অম্লতা বৃদ্ধি পায় সেখানে অন্ততঃ ৫ বৎসরে একবার মাঠে কৃষক চুণ ছড়িয়ে থাকেন। এই চুণের সহিত কিছুটা ম্যাগনেসিয়াম যোগ করলে ভাল হয়। কারণ এর ফলে মাঠে কিছুটা ম্যাগনেসিয়াম দেওয়া হয়। তা বাদে যদি চুণের নিরপেক্ষ করবার ক্ষমতা ধরা হয় তবে ১০০ সম পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম অকসাইড এর নিরপেক্ষ করিবার ক্ষমতা হয় ১১০। মিশ্রসার ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত

হচ্ছে কারণ এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। মিশ্র সারের মধ্যে কিছু ম্যাগনেসিয়াম থাকে যার ফলে সারপূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। ডলোমাইটে শতকরা ২২ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অকসাইড থাকে আর ৩০ ভাগ ক্যালসিয়াম অকসাইড থাকে।

হাইড্রেটেড ডলোমাইট

যখন ডলোমাইট গরম করা হয় বা পোড়ান হয় তখন এর থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড উড়ে যায় বাষ্পাকারে। এতে থাকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর ম্যাগনেসিয়াম অক্সসাইড। যদি ৩০০° সে উত্তপ্ত করা যায় তবে যে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট আকারে থাকে সেটা অক্সাইড আকারে পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডকে ঠাণ্ডা চূণ বা (cold lime) বলে। কারণ ক্যালসিয়াম জলের সহিত মিশে উত্তাপের স্থষ্টি করে (heat of resction) সেজন্য একে চলতি ভাষায় বলা হয় উত্তপ্ত চূণ।

রসায়ণ শাস্ত্রে ম্যাগনেসিয়াম সালফেটকে এপসম্ সণ্ট বলা হয়। পেটের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য ডাক্তাররা এপসম্ সণ্ট খাবার বন্দোবস্ত দেন। আগে যে কার্ণালাইট সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো এর মধ্যে কিছু ম্যানেসিয়াম সালফেট থাকে।

কোন সারটা মাঠে দেওয়া হবে এর নির্দ্ধারণ নির্ভর করে প্রথমতঃ সারের কাজ ও মিশ্র পদার্থের অবস্থিতির পরিমাণের উপর। দ্বিতীয়তঃ যে স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হবে তার দূরত্বের উপর। এই মিশ্র পদার্থের দাম এত বেশী যে কৃষকেরা অনেক সময় মাঠে এ সার ছড়াতে ভয় পায়। সেজন্য পটাসিয়ামের সহিত মিশ্র অবস্থায় যে ম্যাগনেসিয়াম সার পাওয়া যায় তার দামও কম ও কাজেও ভাল উপকারী। তবে

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট অতি সহজে জলের সহিত মিশতে পারে কিন্তু কার্বনেট পারে না।

গাছের বীজকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম মিলে একটা নূতন রাসায়নিক পদার্থের আকারে (মিশ্র) অবস্থান করে। সেই জন্য অনেকে বলেন যে যদি ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট আকারে দেওয়া যায় তবে বোধ হয় ভাল কাজ হয়। তবে আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা কোন স্থির সিদ্ধান্ত আসতে পারেন নি।

ক্যালসিয়াম বা চুণ

ক্যালসিয়াম বললে অনেকে না জানতে পারেন কিন্তু চুণ বললে জানেন না বা চুণ কথাটি শোনেন নি এমন লোক বাংলা দেশে খুব কম আছে। কারণ পান খান না বা জীবনে কখনও খাননি এমন লোক বাংলা দেশে নিতান্ত বিরল। ক্যালসিয়াম কথাটি ইংরাজী। ক্যালসিয়াম অর্থ চুণ নয়। পৃথিবীতে যে কয়টি মৌলিক ধাতু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ক্যালসিয়াম তার মধ্যে একটী। যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি। আর চুণ বলতে আমরা সাধারণতঃ চুণ জাত কোন মিশ্র পদার্থকে বুঝি।

আমাদের দেশে চুণ সহযোগে পান খাওয়ার রীতি আছে। পরিমাণ মত চুণ না হলে পানের স্বাদ পাওয়া যায় না। আবার পানে যদি বেশী চুণ পড়ে যায় তবে গাল পুড়ে যায়। কিন্তু এই চুণে থাকে কি? চুণ যে অবস্থায় থাকুক না কেন জলের সহিত মিশে ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড তৈরী করে। কারণ চুণে জল পড়লে দেখা যায় বুড়বুড় করে জলের মধ্য থেকে কোন গ্যাস বেরিয়ে আসছে। প্রথমত এর মধ্যে কোন শূণ্য স্থান বায়ুতে ভর্ত্তি থাকে সেই স্থান জল গ্রহণ করায় সেইখানকার বায়ু বার হয়ে আসছে। আর যদি চুণ কার্বনেট আকারে থাকে তবে জলের সঙ্গে মিশে কার্বণ ডায়অকসাইড বাষ্প তৈরী করে ও ঐ বাষ্প জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।

মাটিতে ক্যালসিয়ামের একটা বিশেষ স্থান আছে। কারণ এর অবস্থিতির পরিমাণের উপর মাটি অম্লতার কম বেশী হয়ে থাকে। একটু

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে লাল কাঁকুরে মাটির উপরি স্তরে ক্যালসিয়াম কম। তার ফলে pHও কম অর্থাৎ অম্লতা বেশী। যতই নীচের স্তরে যাওয়া যায় ততই ক্যালসিয়ামের অবস্থিতির পরিমাণ বাড়ে ফলে অম্লতা কমে যায় বা pH ইউনিট বেড়ে যায়। আমাদের দেশের মাটিতে উপরি স্তরে সব সময়ই দেখা যায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম। লাল মাটি প্রায়ই বালুময় ও তার জল ধারণ করবার ক্ষমতা খুব কম। যে শিলা থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল সেই শিলা থেকে চূণজাতীয় পদার্থ বৃষ্টির জলের সহিত মিশে মাটি থেকে চলে গেছে। ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে মাটিতে অম্লতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

অম্লতা বৃদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি?

মাটিতে জৈব ও অজৈব নানা প্রকারের এসিড আছে বা বিভিন্ন জীবাণু প্রক্রিয়ায় নানা প্রকার জৈব ও অজৈব এসিডের সৃষ্টি হয়। এই এসিডে হাইড্রোজেন থাকে। এসিডের বা অম্লতার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এই হাইড্রোজেন আয়ণের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে। সেজন্য একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে মাটিতে পরিবর্ত্তনযোগ্য (Exchangeable) হাইড্রোজেন আয়ণের (ion) এর পরিমাণ বেশী সে মাটিতে অম্লতার পরিমাণও বেশী। কারণ মাটিতে যে পরিবর্ত্তনযোগ্য হাইড্রোজেন থাকে তার প্রায় সবটাই পাওয়া যায় বিভিন্ন এসিড থেকে। ফলে যদি কোন মাটিতে পরিবর্ত্তনযোগ্য হাইড্রোজেন বেশী থাকে তবে বোঝা যায় যে সে মাটিতে অম্লতার পরিমাণও বেশী। ফলে সেই মাটির pH ইউনিট কম।

সব জিনিষে অম্লতা আছে। কম আর বেশী। বিশুদ্ধ জলের মধ্য

দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি চালালে হাইড্রোজেন আয়ণ পাওয়া যায়। এর ফলে যে হাইড্রোজেন আয়ণ পাওয়া যায় তার পরিমাণকে ধরা হয় নিরপেক্ষ রেখা। কারণ এইটাই সকল বস্তুর অম্লতা নিরুপণের মানদণ্ড। যদি কোন তরল পদার্থে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী হয় তবে হাইড্রোজেনের ঘন সন্নিবেশ হবে ও জলের হাইড্রোজনের পরিমাণ থেকে এই তরল পদার্থের হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী। ফলে এই তরল পদার্থের অম্লতার পরিমাণ জলের অম্লতার পরিমাণ থেকে বেশী।

দুটী বিভিন্ন আকারের পাত্র নেওয়া গেল। একটীতে আধ সের জল ধরে অন্যটিতে ৪ সের জল ধরে। দুটী পাত্রে একই পরিমাণ চিনি মিশান গেল—ধরা যাক আধ সের। ভাল করে মিশিয়ে এই ২টী পাত্র থেকে জল দুটী বিভিন্ন কাপে নেওয়া হলে সাধারণভাবে জল মুখে দিয়েই বলা যায় যে আধসের জল যে পাত্রে সেই জল অন্য পাত্র থেকে বেশী মিষ্টি। তার অর্থ এই যে একই পরিমাণ জলে একটীতে অপরটী অপেক্ষা চিনির পরিমাণ কম। বলা যেতে পারে একটীতে চিনির ঘনত্ব অন্যটীর থেকে বেশী। মাটিতে অম্লতা নিরুপণের বেলায়ও ঠিক এইরূপ। আগেই বলা হয়েছে রাসায়নিক বিশুদ্ধ জলে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তাকে মানদণ্ড ধরে অন্যের সহিত তুলনা করে হাইড্রোজেন আয়ণ এর ঘনত্ব কম বা বেশী নিরুপণ করা হয়। এই নিরুপণ প্রকাশ করা হয় pH আকারে। বলা যেতে পারে হাইড্রোজেন আয়ণের ঘনত্ব।

মাটিতে অম্লতার নিরপেক্ষ রেখা ৭ ইউনিট। pH ইউনিট এর বেশী হলে সে মাটিকে বলা হয় ক্ষারজাতীয় মাটি আর pH ইউনিট কম হলে তাকে বলা হয় অম্ল মাটি। সাধারণভাবেই সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে কোন জিনিষের মূল্য গণিতের সংখ্যায় বেশী হলে সেই জিনিষের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। কিন্তু অম্লতার বেলা উল্টা কেন?

তার প্রধান কারণ হাইড্রোজেন আয়ণের পরিমাণ অঙ্ক শাস্ত্রের লগারিথম ও এ্যান্টিলেগারিথ এ প্রকাশ করা হয়। এর ফলেই সংখ্যা কমার সঙ্গে অম্লতার পরিমাণ বাড়ে।

মাটির অম্লতা সাধারণতঃ ৩ থেকে ১০ pH ইউনিটএর মধ্যে থাকে। যদি ৭ pH ইউনিট মাটিতে অম্লতা ও লবণাক্ততার মধ্যরেখা ধরা হয় তবে যে মাটির pH ইউনিট ৬ সে মাটি, যে মাটির অম্লতার পরিমাণ ৭ pH ইউনিট, সে মাটির অম্লতার থেকে ১০ গুণ অম্লতা বেশী। আবার ৫ pH ইউনিট মাটি ৬ pH ইউনিট মাটি থেকে ১০ গুণ অম্লপূর্ণ সুতরাং ৫ pH ইউনিট মাটি ৭ pH ইউনিট মাটি থেকে ১০০ গুণ অম্লপূর্ণ। তা হলে যে মাটির pH ৪ ইউনিট সে মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০০০ গুণ অম্লপূর্ণ। অর্থাৎ এই মাটি হাইড্রোজেন আয়ণের পরিমাণ নিরপেক্ষ মাটিতে অবস্থিত হাইড্রোজেন আয়ণের থেকে ১০০০ গুণ বেশী। ফলে এর হাইড্রোজেন আয়ণের ঘনত্ব বেশী। আর যে মাটিতে pH ইউনিট ৮ সেখানে মাটিতে নিরপেক্ষ মাটির এক দশমাংশ পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ণ আছে মাত্র।

বেকম্যান pH মিটার বা অম্ল নিরুপণ যন্ত্র সাহায্যে অম্লতার পরিমাণ ঠিক করা হয়। একটা কোন জানা সল্যুউশানকে মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করে অন্যের অম্লতা নিরুপণ করা হয়। মাটির যে অম্লতার পরিমাণ আমরা নিরুপণ করি সেটা মাটির সারা অম্লতার তুলনায় খুবই কম। কারণ অনেক সময় এই হাইড্রোজেন আয়ণগুলি মৃত্তিকা পিণ্ডের মধ্যস্থলে বসে থাকে। তার ফলে সাধারণভাবে সেগুলিকে মৃত্তিকাপরমাণুর মধ্য থেকে বার করা যায় না। যেটুকু অম্লতা সব সময় মাটিতে ক্রিয়াশীল থাকে সেটুকু পরিমাণ অম্লতার পরিমাণ করা হয়। এ ভিন্ন নানা রকম যৌগিক মৃত্তিকা পিণ্ডের মধ্যে এসিড থাকতে পারে।

যে মাটিতে যত কাদামাটি (clay) থাকে সে মাটিতে তত অম্লতা গুপ্ত থাকে। এদিগকে সাধারণতঃ জলের সহিত মিশালে কাদামাটি থেকে হাইড্রোজেন আয়ণ বেরিয়ে আসে না। এবং একমাত্র উপায় পরিমাণ মত মাটি নিয়ে একটু একটু করে চুণ মিশায়ে পরীক্ষা করে দেখা।

মাটির অম্লতার হ্রাস বৃদ্ধি বা মাটির লোনা হওয়া নির্ভর করে সেই স্থানের বৃষ্টিপাতের উপর। প্রথমতঃ বৃষ্টির জলের সহিত মাটিতে যে সমস্ত কার্বনেট জাতীয় পদার্থ থাকে সেগুলি মিশে জলের সহিত মাঠ থেকে. চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে যে সমস্ত মিশ্র যৌগিক পদার্থ আছে সেগুলি যখন জলের সংস্পর্শে আসে তখন সেই মিশ্র পদার্থ থেকে ধাতব পদার্থগুলি জলের সঙ্গে মিশে চলে যায় প্রায় তাদের শূন্য স্থান হাইড্রোজেন নিয়ে অধিকার করে বসে। তার ফলে মাটিও ধীরে ধীরে অম্ল হয়ে পড়ে। আমাদের এই দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তার ফলে মাটিতে যে পরিমাণ কার্বনেট জাতীয় পদার্থ ছিল সেগুলি জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে গিয়েছে। তার ফলে আমাদের দেশের মাটির উপরি স্তরের অম্লতা ৫—৬ pH ইউনিটের মধ্যে। হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায় মাটির নিম্নস্তরে প্রচুর কার্বনেট আছে। এগুলি জলের সহিত চুইয়ে মাটির তলে এসে ঠাঁই নিয়েছে। এই কার্বনেট যদি ১০"—২৫" মধ্যে থাকে তবে গাছের পক্ষে গ্রহণীয় থাকে এর নীচে চলে গেলে সাধারণ গাছের পক্ষে আর গ্রহণীয় থাকে না।

আমাদের দেশের যে অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে ও যতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলে জোয়ার ভাটা খেলে ততদূর পর্য্যন্ত এর মাটি লোনা। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মাটির ওপর

একটা সাদা স্তর পড়ে। শীতকালে ধান কেটে নেওয়ার ফলে সমস্ত সোজাসুজি সূর্য্যের তেজে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে।

গরমে উত্তাপের ফলে মাটি অনেক জায়গায় ফেটেও যায়। এই সময় একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মাটির উপর সাদা রঙের একটা স্তর পড়েছে। দেশের লোকেরা বলবেন—"লোনা বা নুন"। লবন আইন ভঙ্গ করবার সময় এ থেকে অবশ্য লবন তৈরী হয়েছে। কিন্তু এ থেকে খুব বেশী লবন পাওয়া যায়নি। এগুলি সোডিয়াম জাত মিশ্র পদার্থ আর সাদা বর্ণের লোনা মাটির জন্য দায়ী এই সমস্ত রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ। এরই ফলে এখানকার মাটি লোনা ও তার pH ইউনিট ৮এর উপর। এগুলি সাধারণতঃ সোডিয়ম কার্বনেট। যখন উত্তাপের প্রভাবে নীচের জলকণা উপরে এসেছিল কৈসিকার্ষণ প্রভাবে তখন এরা জলের সঙ্গে উঠে এসেছিল। জল উপরে আসার সঙ্গে উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পীভূত হয়েছে। কিন্তু এগুলি মাটির উপর রেখে গিয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ সোডিয়ম কার্বনেট। অনেক সময় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম এই দুইটি ধাতু মিশ্র আকারে মাটিতে থাকে। এর ফলে মাটিতে লবণত্ব খুব বেশী হয়।

আমাদের দেশের মাটিতে ক্যালসিয়াম খুব কম। এর প্রধান কারণ এদেশে অত্যধিক বৃষ্টি দ্বিতীয়তঃ যে শিলা থেকে এই সকল মাটির উৎপত্তি সেই শিলাতেও ক্যালসিয়াম কম ছিল। বাংলা দেশের মাটি উৎপত্তি হয় অধিকাংশ—স্যাণ্ডষ্টোন থেকে। দোঁয়াশ মাটিতে (loamy soil) এক একর জমিতে ৮০,০০০ পাঃ পটাসিয়াম ৭৪,০০০ ক্যালসিয়াম আবার ১৭,০০০ পাঃ ম্যাগনেসিয়াম থাকে। কিন্তু বালুমাটিতে এক একর জমিতে ৭০০ পাঃ পটাসিয়াম ১৭০ পাঃ ম্যাগনেসিয়াম থাকে মাত্র।

যে মাটিই হউক না কেন, এই দুইটি খুব বেশী ও খুব কম যে তালিকা দেওয়া হলো সাধারণতঃ এই দুইটির মধ্যে থাকে।

মাটির নিম্ন স্তরে সাধারণতঃ ১০"—২০" মধ্যে সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে। অর্থাৎ উপরের স্তরের থেকে নীচের স্তরে ধাতব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে। বিশেষতঃ B_2 স্তরে সমুদয় রাসায়নিক পদার্থগুলি জমা হয়। কিন্তু পডজল মাটির কোন কোন সিরিজে দেখা যায় মাটির নীচে ক্যালসিয়ামের ভাগ কমে যাচ্ছে আর ম্যাগনে-সিয়ামের ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। সব সিরিজে অবশ্য হয় না।

মাটিতে অম্লতা বৃদ্ধি হওয়ার প্রধান কারণ মাটিতে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ থাকে সেগুলি মৃত্তিকা পরমাণু থেকে স্থানচ্যুত হয় ও সেই স্থান হাইড্রোজেন অধিকার করে বসে। স্থানচ্যুত এই ধাতব পদার্থের পরমাণুগুলি হয় গাছের শিকড় দ্বারা আকর্ষিত হয় কিম্বা অন্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশে সহজ দ্রব্য হয়ে জলের সহিত মাটির নীচের স্তরে চলে যায় কিম্বা মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। এরই ফলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। মাটিতে এই অম্লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে যে সমস্ত লৌহ জাতীয় মিশ্র পদার্থ বা এলুমিনাম মিশ্র যৌগিক পদার্থ থাকে বা ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ থাকে, সেগুলি তখন দ্রবণীয় হয়ে পড়ে বা সহজে জলের সহিত মিশে যায়। কিন্তু যখন মাটিতে অম্লতার পরিমাণ খুব কম থাকে pH ৬—৭এর মধ্যে তখন মাটির মধ্যস্থিত জলকণার সহিত সহজে মিশে যেতে পারে না। এই মাটিতে গাছের গ্রহণযোগ্য যে ফসফরাস থাকে সে তখন এই সমস্ত লৌহ, এ্যালুমিনাম, ও ম্যাঙ্গানীজ ধাতব পদার্থগুলির সহিত মিশে জটিল (Complex) রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং তখন আর গাছের এই ফসফরাস গ্রহণ যোগ্য থাকে না। আর এই সময়ে যে সমস্ত

বীজাণু আবর্জ্জনা মধ্য থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বার করে তারা অকর্ম্মন্য হয়ে পড়ে বা যে সমস্ত বীজাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনতে সাহায্য করে তারা ক্রমশঃ অকর্ম্মন্য বা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এরই ফলে এই সময়ে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বীজাণু থেকে ফাঙ্গাস জাতীয় বীজাণু বৃদ্ধি পায়, ফলে মাটির উর্ব্বরতা কমে যায়।

আমরা জেনেছি গাছের অনুশিকড় বা অনুলোম দিয়ে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড বেশি নির্গত হয়, জলের সহিত মিশে এই কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড বাষ্প কার্ব্বনিক এসিড তৈরী করে। এই কার্বনিক এসিডে যে হাইড্রোজেন থাকে সেই হাইড্রোজেন ধাতব মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে ধাতব পদার্থগুলিকে স্থানচ্যুত করে' নিজে সেখানে বসে পড়ে। আর জলের সহযোগে এরা গাছের দেহেতে ঢুকে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

কোন বিশেষ pH ইডনিটে সব গাছ ভাল জন্মায় না। এক একটী বিশেষ জাতীয় গাছ কোন একটী বিশেষ pH ইডনিটে ভাল জন্মাবে। নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

pH	অম্লতার পরিমাণ	ফসল জন্মিবার পরিমাণ
৩	অতিশয় অম্ল	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না,
৪	বেশী অম্ল	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না
৫	মাঝারি অম্ল	এতে কোন কোন গাছ ভাল জন্মিবে।
৬	অল্প পরিমাণ অম্ল	সাধারণ ফসল জন্মিবে।
৭	নিরপেক্ষ	সব গাছই ভাল বাড়িবে।
৮	অল্প লোনা	প্রায় সব গাছই জন্মিবে।
৯	মাঝারি লোনা	সব গাছই ভাল বাড়বে না।
১০	অতিশয় লোনা	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না।

মাটির অম্লতা নিবারণ করবার সহজ ও প্রধান পন্থা মাটিতে পরিমাণ মত চূণ যোগ করা। গুঁড়া চূণ বা চূণ জাতীয় পদার্থ মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির অম্লতা দূর করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে লৌহ তৈরী করার চুল্লী থেকে একরকম তলানি ময়লা পাওয়া যায়। তাকে শ্লাজ বলে। এ দিয়েও মাটির অম্লতা দূর করা যায়। ঝিনুক চূণ দিয়েও অনেক সময় মাটির অম্লতা দূর করা যায়। এ ভিন্ন অনেক রাসায়নিক সারের যোগেও মাটির অম্লতা দূর করা যায়। যেমন নাইট্রেট অব সোডা, ছায়নামাইড জাতীয় সার প্রভৃতি।

যে চূণ মাঠে ছড়ান হয় সে চূণ সাধারণতঃ ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম আকারে থাকে। ডলোমাইটে (Ca Mg Co_3) সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত থাকে ২০।১৩। যদি কোন বিশেষ পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অম্লতা দূরীকরণ করবার ক্ষমতাকে ধরা যায় ১০০ ইউনিট তবে সেই পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের ক্ষমতা হবে ১১৯, ক্যালসিয়াম অক্সাইড-এর ১৭৪, ম্যাগ-নেসিয়াম কার্ব্বনেটের ক্ষমতা হবে ১৭২।

অম্ল মাটিতে ফাঙ্গাস ও একটিনোমাইসিস জাতীয়—বীজাণু—মাটির মধ্যে আকৃতি পরিবর্ত্তন করতে সাহায্য করে, যদি মাটিতে অম্লতা কমে যায় বা মাটির pH ইউনিট বেড়ে যায় তবে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বীজাণু অকর্ম্মন্য হয়ে পড়ে। কারণ দেখা যায় যে, pH ইউনিট যে মাটিতে নিরপেক্ষ রেখায় সেই মাটিতে নাইট্রেট উৎপাদনকারী ও নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী ব্যাকটেরিয়া খুব ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু বেশী চুণ দিলে মাটির অম্লতা খুবই কমে যায় তার ফলে আলু জাতীয় যে সমস্ত ফসল ঐ মাটিতে করা হয় তাদের নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও হয়। সেইজন্য সব

সময় নজর রাখতে হবে যে মাঠে কি ফসল হবে। তার উপর নির্ভর করে, মাটির অম্লতা কম বেশী করা যেতে পারে।

মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটি প্রথমে কুঁকড়িয়ে যায় (Crumb) এর ফলে মাটির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরই প্রভাবে মাটিতে মৃত গাছের যে শিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলি মাটির সহিত মিশে যায়। এই সমস্ত অংশ পচে গিয়ে মাটির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশে যায় এবং মাটিকে গ্রানুলার আকারে আসতে সাহায্য করে।

মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর অন্যান্য বীজাণু ক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে মাটিতে যে সমস্ত গাছের শিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলিও পচে যাবে। নডুল ব্যাকটেরিয়াগুলি অধিকতর সকর্ম্মক হয়ে উঠে—ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে এবং অধিকতর নাইট্রেট তৈরী হয়। যে সমস্ত ফসফরাস ও মলিবডিনাম গাছের অগ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে তারা গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। এক কথায় চুণ দিয়ে মাটির pH ইউনিট যদি ৬.৫ করতে পারা যায় তবে মাটির মধ্যে একটা সাজো সাজো রব পড়ে যায়। যা কিছু দূষিত যা গাছের গ্রহণযোগ্য নয় তারা অকর্ম্মন্য হয়ে পড়ে। এযেন মাটিতে বসন্তকাল এসেছে। যা কিছু মলিনতা দূরীভূত করে মাটিকে বৃক্ষ ধারণ উপযোগী করে তোলে। বসন্তে গাছগুলি যেমন নূতন পত্র পুষ্পে শোভিত হয় তেমনি মাটিতেও একটা নূতন চাঞ্চল্য এসে যায়। যে সমস্ত জিনিষ মাটিতে থেকেও গাছের কোন কাজ আসেনি তারাও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। ফুটবল খেলায় যেমন না চেঁচালে খেলোয়াড়দের উদ্যম বাড়ে না সেই রকম মাটিতে চূণ ছড়ালে মাটির মধ্যে চারিদিকে কার্য্যকারিতা বেড়ে যায়। এ যেন মাটিতে নূতন একটী জীবনী শক্তি।

যে সমস্ত গাছ বেশী মাত্রায় ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করে তাদেরও এগুলি অতি অনায়াসলব্ধ হয়ে পড়ে!

ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা

(১) গাছের দেহেতে যে সমস্ত কোষ আছে তার মধ্যে ক্যালসিয়াম পেকটেট নামক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। এর অভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারিয়ে গাছ বেঁটে হয়ে যায়।

(২) ক্যালসিয়াম গাছকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। মানুষের দেহেতে যেমন ক্যালসিয়ম ফসফেট থাকে বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের মাঝে যার ফলে মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে সেই-রকম গাছেরও এর প্রয়োজন আছে সোজা হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য।

(৩) গাছের দেহেতে অনেক সময় অনেক জৈব-এসিড (organic acid) তৈরী হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটা-সিয়ামএর প্রভাবে এই অম্লতা নষ্ট হয়ে যায়, এর অভাবে গাছ বেঁটে হয়ে যায়। বীজের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম থাকে তার প্রভাবে গাছ খানিকটা বেড়ে উঠে, তারপর মাটির মধ্য থেকে আর কোন ক্যালসিয়াম না পেলে গাছের বৃদ্ধি আর হয় না। যদিও গাছ অনেক সময় মরে' যায় না তথাপি গাছ 'বামন' হয়ে যায়।

ক্যালসিয়েমের অভাব (গাছের পক্ষে) প্রথমেই দেখা যায় কচি পাতায়। কচিপাতা সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলে। আরও কিছুদিন গেলে দেখা যায় গাছ যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। আরও কিছু-দিন গেলে দেখা যায়—যে গাছের পাতা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে নীচে

চলে গেছে। গাছের পাতার সবুজ রঙ হারিয়ে গেলে পরে পাতা পড়ে যায়। গাছের পাতার কিনারায় ও আগায় ক্যালসিয়াম হীনতার লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের ডাঁটা মোটা হয়ে যায় এবং পাতা পুরু হতে থাকে। পাতাগুলি অনেক সময় গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। গাছের শিকড়ের কোন বিশেষ আকার থাকে না। শিকড়ের আগাগুলো আর স্থচাল থাকে না। ভোঁতা হয়ে যায়। গাছের সারা দেহের যে কোন অংশের তুলনায় পাতায় সবথেকে বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। সূর্য্যমুখীর পাতায় ক্যালসিয়াম শতকরা —৭.৬৪ ভাগ। মটরের আগার কচি পাতায় শতকরা—৬.৫৩ ভাগ। তামাকের পাতায় শতকরা—৬.৩৭ ভাগ। যইএর (Oats) ডাঁটায় শতকরা—০.১৫ ভাগ, গমের ডাঁটায়—০.০৮ ভাগ, ধানের ডাঁটা ৩.০৭ ভাগ আর সব থেকে কম থাকে আলুতে শতকরা—০.০৪ ভাগ মাত্র।

ফসল মাঠ থেকে কেটে আনার সাথে সাথে গাছের দেহের মাধ্যমে মাঠ থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। নীচে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

ফসল	একরে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ।	ক্যালসিয়াম অপসারণ।	ম্যাগনেসিয়াম অপসারণ।
আলফালফা	৮ টন	১০০ পাঃ	৫০ পাঃ
বাঁধাকপি	১০ ,,	১০ ,,	৪ ,,
ভূট্টা (শস্য)	১০০ বুশেল	১ ,,	১০ ,,
যই	৫০ ,,	২ ,,	২ ,,
সোয়াবীন	২৫ ,,	৫ ,,	৫ ,,
আলু	৪০০ ,,	২ ,,	২০ ,,
গম	৩৫ ,,	১ ,,	৩ ,,

গাছের যদি ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হয় তার লক্ষণ প্রথমেই ফুটে ওঠে গাছের বুড়ো পাতায়। গাছের সবুজকণা বা ক্লারোফিল-এ অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং গাছের পাতা সবুজ রং হারিয়ে হলুদিয়া হয়ে পড়ে। এই হল্‌দে হয়ে শুকিয়ে যাওয়ার রীতি প্রথমে পাতায় দেখা যায়। যে সমস্ত উপশিরার অন্তবর্ত্তী স্থান আছে সেগুলি হল্‌দে হয়ে পড়ে। প্রথমে জলীয় অংশ হ্রাস পায়। গাছের নীচের দিককার পাতার শিরা ও উপশিরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সবুজ রঙ কমে যেতে থাকে ও সাদা হয়ে যেতে থাকে। দেখতে অনেক সময় ভাইরাস রোগে আক্রমণের মত হয়। গাছের মাঝামাঝি অংশের পাতার রঙ হলদে হয়ে আসে। কিন্তু উপরের পাতা স্বাভাবিক রকমের সবুজ থাকে। কতকগুলি গাছের পাতা যেমন তূলা, লাইমাবীন, ষ্ট্রবেরী ইত্যাদি গাছের পাতা ক্রমশঃ লাল হয়ে পড়ে। কিন্তু শিরাগুলি গাঢ় সবুজ থাকে।

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে মাটিতে কাজ করে চলে, যদিও একের কাজ অন্যে করতে পারে না বা একে অন্যের পরিপূরক নয়। তবুও এদের যেন কোথায় একটা নাড়ীর টান আছে, মাটিতে এদের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু মাটিতে মোট ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত ২ থেকে ১ মধ্যে থাকে। মাটিতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে তার ফলে এদেরও পরিবর্ত্তন হয়। ফলে এদের অনুপাত কোন নিয়মমাফিক ধারায় চলে না। ক্যালসিয়াম প্রায় সব মাঠেই অল্প বিস্তর থাকে তার ফলে দেখা যায় গাছ প্রায়ই এর অভাব বোধ করে না। কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের অভাব অনেক মাটিতেই আছে।

ক্যালসিয়াম. ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম মাটিতে থাকে ত্রয়ী হয়ে।

যদি এই রকমের মাটিতে পটাসিয়াম অধিক গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে তবে গাছ পটাসিয়ামের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয় এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ হ্রাস পায়। কিন্তু যে মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব আছে সে মাটিতে অধিক মাত্রায় পটাসিয়াম যোগ করলে ম্যাগনেসিয়াম-এর অভাব বেশী প্রতিভাত হয়ে উঠে। এর জন্য মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশী করে রাখা ভাল। মাটিতে ক্যালসিয়াম যোগ করলে দেখা যায় যে গাছ অধিকতর ফসফরাস গ্রহণ করছে।

কোন অম্ল মাটিতে গাছ জন্মায়

অম্ল মাটিতে সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে। যে সমস্ত গাছ অম্ল মাটিতে ভালভাবে জন্মিতে পারে সেই সমস্ত গাছ এমন একটী স্বভাব তৈরী করে যার দ্বারা এই ক্যালসিয়াম ব্যতিরেকে গাছ কাজ করতে পারে। এর ফলে গাছের দেহেতে এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানীজের অংশ বেশী হয়ে পড়ে। আলু একটু অম্লপূর্ণ মাটিতে ভালভাবে জন্মাতে পারে। এর বেশী অম্লতা অর্থাৎ মাটি আরও বেশী অম্ল হলে আলুতে স্কল রোগ জন্মায়। এর ফলে যে গাছ অম্ল মাটিতে ভালভাবে বৃদ্ধি পায় সে গাছের দেহেতে ক্যালসিয়ামের অংশও কম। কিন্তু সাধারণভাবে মাটিতে ক্যালসিয়াম যত কমই থাকুক গাছ নিজের প্রয়োজনানুযায়ী ক্যালসিয়াম মাটি থেকে সংগ্রহ করে। টিমথি ও রেড টপ ঘাসে শতকরা ০.৪০ ভাগ, রাইতে শতকরা ০.২২ ভাগ, জনার বজরা ইত্যাদতে শতকরা ০.৯৬ ভাগ ক্যালসিয়াম থাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত গাছ বা ফসল অম্ল মাটিতে জন্মায় তারাও মাটি থেকে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে। যে মাটির pH ইউনিট নিরপেক্ষ রেখায়

সেখান থেকে সবচেয়ে বেশী ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে আলফাল্‌ফা। পরিমাণ ২.৬%। আর অম্ল মাটি থেকে রাই ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে ০.২২% ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি ফসল অম্ল মাটিতেও ভালভাবে জন্মাতে পারে। যেখানকার মাটি অম্লতাপূর্ণ অর্থাৎ pH আনুমানিক কম বেশী ৪ ইউনিট সেখানে অম্লতা সহকারী ফসল করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতি বৎসর একই ফসল করলে সামান্য যে ক্যালসিয়াম থাকে সেটুকু গাছের মাধ্যমে দূরীভূত হবে ও মাটির অম্লতা আরও বেড়ে যাবে। তখন আর সেই ফসলও ভাল হবে না; যেমন আমাদের দেশের মাটিতে বৎসরের পর বৎসর ধান উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে মাটিতে ধান গাছের প্রয়োজনানুযায়ী পদার্থগুলি ক্ষয় পেয়ে যায়। আর যে পদার্থগুলি ধান গাছের প্রয়োজন হয় না সেগুলি মাঠেতে পরিমাণে বেড়ে যায়। যদি অম্লতা সহকারী ফসলের মধ্যে এই ক্ষেতে শস্য পরিবর্ত্তন কিংবা রোটেশান করা যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যাবে আর চূণ না দিয়েও অম্লতা হ্রাস করা যেতে পারে। মটর, সীমও ঈষৎ লাল রঙের ক্লোভার জাতীয় ফসলের রোটেশান করলে মাটির উর্ব্বরতা সমান থাকবে। কেবলমাত্র আলু বাদে আর অন্য যে কোন ফসল এই মাটিতে কেবলমাত্র পরিমাণমত চূণ দিয়ে বেশী ফসল পাওয়া যাবে। এমনকি উৎপাদিত ফসলও দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।

মাটিতে কোন মতেই কোন রাসায়নিক সারের সহিত মিশিয়ে চূণ দেওয়া উচিত নয়। কারণ চূণের স্বভাব হল যদি সেই সারে এমোনিয়া থাকে তাকে টেনে বার করা। সুতরাং যদি এমোনিয়া নষ্ট হয়ে যায় তবে আর সারের বিশেষ মুল্য থাকে না, কারণ গাছের উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া এদের অভাবে ফসফরাস মিশ্র পদার্থ আর দ্রবণীয় থাকে না, অনেক সময় সার উৎপাদন করবার

জন্য ১৫ থেকে ২০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জলীয় চূণ (hydrated lime) ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে সার তৈরী করবার সময় যে সমস্ত এসিড তৈরী হয় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তবে অনেক সময় সারের সঙ্গে পোড়া চূণ ব্যবহার করা হয়। সব সময়ই নজর রাখতে হয় এদের যেন পরিমাণ কম থাকে, শতকরা ৫ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় মাঠে ম্যাগনেসিয়াম দেওয়ার জন্য একরে ২০০ পাউণ্ড ডলোমাইট দেওয়া হয়। আবর্জ্জনা সারের সহিতও চূণ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর আবর্জ্জনা সার দিয়েও চূণের কাজ হয় না। অবশ্য অনেক সময় অন্য দিক দিয়ে চূণের কাজ হয়। লৌহ চুল্লীর তলানি ময়লা (basic slag), ছায়নামাইড, প্রভৃতি সারেতে মুক্ত চূণ থাকে, ফলে এগুলি দিলেও মাটির অম্লতা কিছু পরিমাণে কমতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ সার দিয়ে যেমন এমোনিয়া ও ফসফরাস জাতীয় সার দিয়ে মাটির অম্লতা নষ্ট করা যায় না। প্রথমতঃ সারের দাম বেশী। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি জাতীয় মিশ্র পদার্থ থাকে সেগুলির সহিত প্রায় সব সময়ই জোরাল এসিড (Concentrated acid) মিশে থাকে। ফলে বীজাণু ক্রিয়াতে মাটির এসিডের ভাগ বেড়ে যায়। জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফেট থাকে। কিন্তু চূণের বদলে জিপসাম ব্যবহার করা যায় না। বরং লোনা মাটিতে জিপসাম দিয়ে মাটির অম্লতা বাড়ানো যায়। ফসফেট লোনা মাটির সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে ও তার pH কমাতে সাহায্য করে।

অনেক সময় অম্ল মাটিতে সুপার ফসফেট দিলে লৌহ, এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানীজ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট পরমাণুগুলি অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। সুপার ফসফেট কিছু পরিমাণে চূণের কাজ করলেও বেশী দিন স্থায়ী হয় না, এবং ফসফরাস ও গাছের গ্রহণযোগ্য থাকে না।

অম্লতা নিবারণে চূণ প্রয়োগ বিধি

কোন মাটিতে কতটা চূণ দিলে কি পরিমাণে pH এর পরিবর্ত্তন হয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কারণ এটা নির্ভর করে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কি প্রকারে চূণ যোগ করা হবে অর্থাৎ প্রয়োগ পন্থা, এবং সেই স্থানের বৃষ্টিপাত, মাটির মধ্যস্থিত জলের পরিমাণ এবং মাটির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বৈশিষ্ট্যের উপর। কৃষি গবেষণাগারে মাটির অম্লতা দূরীভূত করবার পদ্ধতি দ্বারাতে কেবলমাত্র আংশিক অম্লতা দূরীভূত হয়। এ ভিন্ন মিশ্র অবস্থায় কাদামাটির পরমাণুর মধ্যস্থলে অনেক অম্ল বৃদ্ধিকারক পদার্থের পরমাণু থাকে যারা সহজে জল সহযোগে সেই স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না এবং আসেও না। কিন্তু মাটিতে যদি চূণ যোগ করা হয় তবে তারা অনায়াসে স্থানচ্যুত হয় ও ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সেজন্য সব থেকে সুবিধা পরিমাণ মত মাটি সংগ্রহ করে তাতে পরিমাণ মত অল্প থেকে বেশী চূণ যোগ করে তার অম্লতার পরিমাণ কি পরিমাণে কমছে দেখে সেই পরিমানুযায়ী মাঠেতে চূণ যোগ করাই বিধেয়। বালিময় দোঁয়াস মাটিতে (Sandy loam) যদি ২ টন চূণ ভাল করে গুঁড়া করে (১০০ মেস ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে) মাঠে ছড়ান যায় তবে দেখা যায় ১০ বৎসরে ঐ মাটির অম্লতা ৫.২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে এসেছে। যদি দেড় টন জলীয় চূণ ছড়ান যায় তবে ঐ মাঠের উপরের ৬ ইঞ্চি মাটির pH ৫.২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে আসতে ১০ বৎসর সময় লাগবে। কিন্তু দেখা যাবে ঐ মাঠের এরই নিম্ন স্তরের মাটিতে pH এই দীর্ঘ বৎসরে মাত্র ৫ ইউনিট থেকে ৫.৬ ইউনিটে এসেছে।

এক লিটার পাতনিক জলে ০·০০০০০০১ গ্রাম সকর্ম্মক হাইড্রোজেন থাকে। ১ লিটার (N) সাধারণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ১ গ্রাম

হাইড্রোজেন থাকে। স্থতরাং ০.০১ সাধারণ এসিডে ০.০১ গ্রাম হাইড্রোজেন থাকে। স্থতরাং নিরপেক্ষ মাটি ০.০০০০০০১ গ্রাম (H) থাকে। এত বড় একটি গণিতিক সংখ্যাকে কম বেশী করতে গেলে অস্থবিধা হয় বলে একে ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করে লবে' নিয়ে আসা হয়। $০.০০০০০০১ = \frac{১}{১০০০০০০} = (১০)^{৭}$ ও লগারিথমে প্রকাশ করা হয়। লগারিথমে প্রকাশ করলে পাওয়া যায় ৭। PH হাইড্রোজেন আয়ণের লাগারিথম প্রকাশ মাত্র।

গুঁড়া করে মাটিতে চুণ দিলে চুণ তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। কিন্তু ডেলার আকারে দিলে মাটির সঙ্গে মিশতে সময় লাগে। তাতে কাজ ও ভাল হয় না। কিন্তু যে মাটিতে বালু বেশী বা বালুময় সে মাটিতে চুণ যদি ডেলার আকারেও দেওয়া যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ বালু মাটিতে এই চুণ ডেলার আকারে দিলে প্রয়োজনানাযায়ী ক্যালসিয়াম চুণ থেকে বেরিয়ে মাটির অম্লতা দূর করতে সাহায্য করবে। মাটিতে জলের সহ্নিত ঝিনুকে চুণ মিশিয়ে দেওয়া ভাল কিম্বা চুণ খুব ভাল করে গুঁড়া করে দেওয়া উচিত। আমাদের এই বাংলা দেশের গাঙ্গেয় অববাহিকার মাটি পলি দিয়ে গড়া। এতে সাধারণত বালুকণা ও বালুর স্তর প্রধান। ৪ থেকে ৬ বৎসর অন্তর মাটিতে দেড় টন চূণ দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কাদা মাটিতে এরও বেশী চূণ যোগ করতে হয়। পলি মাটিতে এর থেকে কম। যেখানে বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে চূণও বেশী যোগ করতে হবে।

মাটিতে চূণ যোগ করবার সময়

কলের লাঙ্গল দিয়ে মাটি চষবার সময় মাঠেতে অর্দ্ধেক চুণ দিয়ে দেওয়া উচিত। এ দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। চুণ মাটির সঙ্গে ভাল

ভাবে মিশবার সময় পাবে। এ বাদে যখন (Disc harrow) ডিস্ক হ্যারো দিয়ে মাটি খোঁড়া হয় তখন বাকী অর্দ্ধেকটা দিয়ে দিলে ভাল হয়। সব সময়ই দেখা গেছে যে মাটিতে বীজ বপন করার আগে চূণ ছড়ানোর পর্ব্ব সমাধা করতে হয়। অনেকে মাটিতে যখন ফসল থাকে তখন চূণ যোগ করে থাকেন। এতে ভাল ফল সে বছর পাওয়া নাও যেতে পারে। অনেকে মাঠে ফসল উঠে গেলে প্রথম চাযের সঙ্গে সঙ্গে মাঠেতে অর্দ্ধেক চূণ ছড়িয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। পরে মাঠে বীজ ছড়াবার কিছু আগে বাকি অর্দ্ধেক চূণ দিয়ে দিলে ভাল হয়। মাঠে চূণ ছড়ালে চূণ নিজে গাছের কোন উপকার করতে পারে না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে চূণ মিশতে পারে গাছের পক্ষে ততই ভাল। চূণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিলতে প্রথম দরকার জলকণা দ্বিতীয়তঃ মাটির সংস্পর্শে আসা।

যে মাটিতে অম্লতা অল্প অর্থাৎ মাটির অম্লতার পরিমাণ ৫.৮ ইউনিট থেকে ৬'৮ ইউনিট-এর মধ্যে সেখানে বীজের নীচে যদি চূণ দেওয়া যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এতে চূণের ক্ষয়ও কম হবে। যে মাটিতে আলু বা তামাকের চাষ করা হয় সেখানে ফসল উঠে গেলে পর মাঠেতে চূণ দেওয়া উচিত। কারণ মাঠেতে চূণ দিলে মৃত্তিকা-রক্ষিত গাছের রোগের বীজাণুগুলি সকর্ম্মক হয় স্থতরাং তখন যদি মাঠে ফসল থাকে তবে সে ফসলের গাছ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

চূণের ক্ষয়

বৃষ্টির জল অনেকটা চূণ মাটি থেকে বয়ে নিয়ে যায়। আর জলের সহিত মিশে কিছু চূণ চুইয়ে মাটির নীচে চলে যায়। যেখানে বৎসরে ৩০" বৃষ্টি হয় সেখানে অবশ্য চূণের ক্ষয় মাটির টাইপের উপর

নির্ভর করে। বৃষ্টির জল বৎসরে ১০০ পাঃ ক্যালসিয়াম অকসাইড মাঠ থেকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। চুইয়ে প্রায় ৫০ পাউণ্ড নষ্ট হয়। আমাদের দেশে এই অঞ্চলে প্রায় ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং বৃষ্টির জলে ৩০০ পাউণ্ড আর চুইয়ে ১০০ পাঃ চূণ মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে। চূণ অন্যান্য পদার্থের মত মাটির নিম্ন স্তর থেকে উপরে উঠে আসতে পারে না।

অম্লতা বৃদ্ধির উপায়

এতক্ষণ অম্লতা হ্রাস করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল এখন দেখা যাক কি করে অম্লতা বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ কি করে লোণা মাটির লবণত্ব নষ্ট করা যায়। ফসলের পক্ষে দুইই ক্ষতিকর। যেমন বেশী অম্ল মাটিতে ভাল ফসল হয় না তেমনি বেশী লোনা মাটিতেও ভাল ফসল হয় না।

গন্ধক গুঁড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করার প্রধান উপায়। কিন্তু সব সময় গন্ধক পাওয়া যায় না। আর এতে খরচও বেশী হয়। এ বাদেও আরও কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থ আছে যা দিয়ে অম্লতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যেমন সালফিউরিক এসিড, এমোনিয়াম সালফেট, ও অম্লপূর্ণ পীট মাটি। এক একর জমিতে ৪০০ পাউণ্ড গন্ধক গুঁড়া করে মিশালে সেই বৎসরই মাটির অম্লতা ½ pH ইউনিট কমে যাবে। ফুলের বাগানে সাধারণতঃ এমোনিয়াম সালফেট দেওয়া হয়। যেখানে গাছের বৃদ্ধির প্রয়োজন সেখানে এমোনিয়াম সালফেট দিলে গাছ নাইট্রোজেন পায় আর সালফেট মাঠের অম্লতা বাড়াবে।

মাটিতে চূণ দেওয়ার পর যদি মাঠেতে এমোনিয়াম সালফেট দেওয়া হয় তবে এই সার থেকে কয়েকটী বিশেষ বীজাণু ক্রিয়ার প্রভাবে

এমোনিয়া ও সালফেট তৈরী হয়। পরে এমোনিয়া থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরী হয় ও মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করে। আর সালফেট থেকে সালফার বেরিয়ে এসে নানা বীজাণু ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে সামান্য পরিমাণে সালফিউরিক এসিড তৈরী করে। সে কারণে এমোনিয়াম সালফেট মাঠে দিলে মাঠের অম্লতা বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর মাঠেতে চূণ যোগ করলে ঐ অম্লতা দূরীভূত হয়। মাটিতে চূণ দিলে লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে বেশী নাইট্রোজেন টেনে আনবে। ফলে মাঠের নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ বিশেষ বীজাণু ক্রিয়ার ফলে গাছ বেশীমাত্রায় ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করতে পারে। ফলে এই দুইটী সার কমে যেতে পারে। সেকারণ এই দুইটী সার যে বৎসর মাঠেতে চূণ দেওয়া হয় সে বৎসর একটু বেশী পরিমাণে দেওয়া উচিত।

মাটির উপরি স্তরে সোডিয়াম জমা হওয়ার প্রধান কারণ মাটির আভ্যন্তরীণ জলের প্রবাহ সব সময়ই উপরি স্তরে থাকে। বাংলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায় যে মাটির উপরে একটা সাদা স্তর পড়েছে। এই মাটিকে চাষের উপযোগী করতে গেলে দরকার হয় গভীর নালা কেটে মাটির আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহকে নীচে নিয়ে যাওয়া। গাছ কিন্তু সোডিয়াম কার্ব্বনেটের চেয়ে সোডিয়াম সালফেট বেশী গ্রহণ করে। গন্ধক দিয়ে কার্ব্বনেট সালফেটে পরিণত হয়। কিন্তু সব থেকে ভাল হয় যদি এক একর জমিতে ৩০০ পাউণ্ড গন্ধক, ১০০ পাউণ্ড জিপসামও অন্ততঃ ৩০ টন আবর্জ্জনা সার এক সঙ্গে মিশিয়ে ছড়ান যায়।

মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ

সাধারণতঃ নাইট্রোজেন পটাশ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম মাটিতে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে বেশীমাত্রায় থাকে। সেজন্য এগুলিকে প্রধান রাসায়নিক পদার্থ বলা হয়। এ ভিন্ন মাটিতে বোরণ, তামা, লোহা, মাঙ্গানীজ, দস্তা (Zinc) কোবাল্ট, এলুমিনাম্, মলিবডিনাম, সালফার, ক্লোরিন, সেলেনিয়াম ও আইডিন প্রভৃতি অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ খুব কম মাত্রায় থাকে। সে জন্য এগুলিকে বলা হয় মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ। গাছকে যদি সুস্থ ও সতেজ করে গড়ে তুলতে হয় তবে এদের প্রয়োজন আছে। এদের প্রয়োজন গাছের এত কম যে প্রায়ই মাটিতে এদের পরিমাণ ঠিকই থাকে, বছরের পর বছর সামান্য মাত্রায় মাঠ থেকে উঠে গেলেও গাছের চাহিদা মেটাবার মত পরিমাণ মাটিতে থেকে যায়। এদের মধ্যে লোহা, বোরণ, ও ম্যাঙ্গানীজ এর অভাব হলে গাছের দেহেতে যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া চলে তার কোন না কোনটীর ব্যাঘাত ঘটে। ফলে কোন কোন রোগের চিহ্ন দেখা যায়।

আজকাল পৃথিবীতে প্রধান সার নিয়ে যত না কাজ হচ্ছে তার বেশী কাজ হচ্ছে এই অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলি নিয়ে। মাটির মধ্যে এই সমস্ত অপ্রধান পদার্থগুলির ঠিক ঠিক স্বভাব জানা যায় নি। তবে গাছের যে প্রয়োজন আছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এদের প্রয়োজন গাছের অতি অল্প পরিমাণে। কেন এদের প্রয়োজন? গাছের দেহেতে গিয়ে এরা কি কাজ করে? আজও নিশ্চিত করে বলা

কষ্টকর। তবে এটুকুখানি মৃৎ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে মাটিতে গাছের বৃদ্ধির জন্য অন্য প্রধান রাসায়নিক সারগুলি থাকলেও কেবলমাত্র এই অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলির অভাবে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না। গাছ একেবারে মরে যায় না সত্য কিন্তু তার ফসল কমে যায়।

একই গাছের পক্ষে সবগুলি অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজন হয় না। এক একটীর জন্য এক একটী বিশেষ অপ্রধান পদার্থের প্রয়োজন হয়। সেই একটী কি দুইটি পদার্থ ব্যতিরেকে গাছ বাড়লেও তার ফসল ভাল হয় না। সেই বিশেষ একটী পদার্থের অভাবে গাছের নানা রোগ জন্মায়।

আনাজী কলাতে লৌহ আছে অমরা সবাই জানি, কিন্তু এই আনাজী কলা লৌহ পেলো কোথায়? গাছ মাটি থেকে এই লৌহ সংগ্রহ করেছে, মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক একর জমিতে ৩ পাউণ্ডের বেশী লৌহ নেই। অথচ কাঁচ কলাতে ৫ থেকে ১০ পি, পি, এম লৌহ রয়েছে। এ দিয়ে বোঝা যায় যে আনাজী কলাগাছ মাটি থেকে লোহা টেনে নেয়।

কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কাজে এই অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলি কাজে লাগে।

(১) কোন কোন গাছের এগুলি বিশেষ বিশেষ খাদ্য, সবগুলিকে একত্রে গাছের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও এদের মিশ্রিত কোন কোন বিশেষ দ্রব্য গাছ শিকড় দিয়ে টেনে নেয়। এদের, গাছের বৃদ্ধিতে বেশ প্রয়োজন আছে।

(২) অনেক সময় দেখা যায় মাটিতে কোন প্রধান রাসায়নিক পদার্থের অভাব হলে এই সমুদয় প্রধান পদার্থের অভাব পূরণ করে। অবশ্য

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব বোরণ দিয়ে মিটান যায় না। এটা যেন আমাদের দেশে যে চলতি কথা আছে মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ এর মত। এখানে যেমন দুইটি পদার্থের মধ্যে মিষ্টতা বর্ত্তমান ওদের তেমনি উভয় ধাতব পদার্থে সমগুণ সম্পন্নতা থাকে।

(৩) অনেক সময় গাছের দেহেতে ভিটামিন তৈরীতে এরা সাহায্য করে।

(৪) কোন কোন পদার্থ মাটির মধ্যে বেশী থাকে ও তার ফল ক্ষতিকর হয়, ফলে তাদের প্রভাবে গাছ মরে যায়। এই অপ্রধান ধাতু মাটিতে থেকে সেই বিষাক্ত আবহাওয়া নষ্ট করে দেয়।

(৫) এর অবস্থিতির ফলে গাছের অনেক সময় রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ে।

(৬) এরা অনেক সময় গাছের দেহেতে উত্তেজনা আনে।

উপরে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা গেল এগুলি সবই সম্ভাব্য পর্য্যায়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না তবে এটা স্থির নিশ্চিত যে এদের প্রভাবে গাছের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। এ যেন ঠিক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পরিবেশকের খাবার যাচাই করা। একটু একটু খেতে খেতে বেশী খাওয়া হয়ে যায়। ফুটবল খেলায় দর্শকের চেঁচা-মেচিতে অন্যের কোন কাজ হউক আর নাই হউক খেলোয়াড়ের প্রাণ দিয়ে খেলতে ইচ্ছা হয়। তেমনি এই অপ্রধান পদার্থগুলি উপস্থিতিতে গাছের খাওয়ার ইচ্ছা বাড়ে।

গাছের পক্ষে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়

বেশী পরিমাণে	খুব কম পরিমাণে
নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, অক্সিজেন, কারবণ, হাইড্রোজেন।	লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তামা, দস্তা, বোরণ, মলিবডিনাম।

গন্ধক (Sulfur)

গ্রীষ্মাঞ্চলের মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থের সহিত মিশে গন্ধক অবস্থান করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে ১০০ থেকে ৩০০ পি, পি, এম পর্য্যন্ত সালফার পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থের অবস্থানের পরিমাণের উপর সালফারের অবস্থান নির্ভর করে। শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ভূমিতে সালফার সাধারণতঃ 'B' স্তরে পাওয়া যায়।

যদি কোন দেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় যে, N, $P_2 0_5$, $K_2 0$ ও $S0_3$ এর অবস্থানের পরিমাণের অনুপাত ১ : ০.৪ : ০.৬ : ০.৩।

অতি সহজেই গন্ধক গাছের পাতায় ঢুকতে পারে। গাছের প্রোটিন তৈরী করতে গন্ধকের দরকার হয় আর এর পরিমাণ ঠিকমত থাকলে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় না ও গাছের এমোনিয়া নাইট্রোজেন নিতে কোন কষ্ট হয় না। লেগুমিনাস জাতীয় গাছের বেশী গন্ধক প্রয়োজন। গন্ধক লেগুমিনাস জাতীয় গাছের নডুল বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

গাছ সোজাসুজি মাটি থেকে সালফেট (S04) গ্রহণ করতে পারে।

পৃথিবীর উপরিভাগে বাতাসে ০·০৫ পি, পি, এম সালফেট আছে। বাতাসে কার্বন ও সালফেটের অনুপাত ২৪০০ : ১ কিন্তু গাছের পাতায় ১৫০ : ১। খুব সম্ভবতঃ এর কিছু পরিমাণ সালফার গাছ বাতাস থেকে সংগ্রহ করে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পচে মাটিতে গন্ধক জমা হয়। অনেকে মনে করেন হাইড্রোজেন সালফাইড আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে বেরিয়ে আসে পরে অক্সিজেনের প্রভাবে সালফেটে পরিণত হয়।

এ সালফেট অতি সহজেই জলে দ্রবণীয়। সুতরাং আর্দ্র অঞ্চলে ইহা অতি সহজেই জলের সহিত চুইয়ে যেতে পারে বা গড়িয়ে মাটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। মাটিতে যে সালফেট আছে সেটা যদি গাছ গ্রহণ না করে তবে চুইয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন এক একর জমি থেকে ৪১.৮ পাঃ নাইট্রোজেন চলে যায়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে কিছু গন্ধক মাটিতে এসে পড়ে। এক একর জমিতে বৎসরে প্রায় ৩০ পাঃ গন্ধক যোগ হতে পারে। সুতরাং গন্ধকের ক্ষয় অনায়াসে পুরণ হয়। সাধারণতঃ একক সুপার ফসফেটে শতকরা ৩০ ভাগ SO_3 ও ২০ ভাগ P_2O_5 থাকে। এমোনিয়া সালফেটে ৬০ ভাগ SO_3 ও শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আবর্জ্জনা সারে টন প্রতি ৪ পাঃ SO_3 থাকে।

মাঠেতে সারের সঙ্গে যে SO_3 দেওয়া হয় ও বাতাস থেকে বৃষ্টির জলে যে পরিমাণ SO_3 মাটিতে পড়ে তার পরিমাণ মাঠ থেকে গাছ যে পরিমাণে SO_3 টেনে নেয় তার পরিমাণ থেকে বেশী। সে কারণে যে মাটিতে সার দেওয়া হয় সে মাটিতে সাধারণতঃ গন্ধকের অভাব হয় না।

বোরণ (Boron)

প্রাণিদেহে বা জীবদেহে খুবই অল্প পরিমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ২ থেকে ১০ পি, পি, এম এর মধ্যে। মাটিতে প্রায় ঐ একই পরিমাণে থাকে। অবশ্য যে পাথর থেকে মাটি তৈরী হয় সেই পাথরে এর পরিমাণ এর থেকে একটু বেশী থাকে। মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব বোরণ পূর্ণ করতে পারে না সত্য কিন্তু ক্যালসিয়ামকে দ্রবণীয় করতে সাহায্য করে। গাছের দেহেতে বা কোষমধ্যে অনবরত অক্সিজেন হ্রাস বৃদ্ধি চলছে, তার সমতা রাখতে বোরণ সাহায্য করে।

পাথরে যে বোরণ থাকে সেই পাথর থেকে তৈরী মাটিতে বোরণ সামান্য মাত্র এলেও তা দিয়ে গাছের বিশেষ কোন কাজ হয় না। কিন্তু সামুদ্রিক গাছ বা সমুদ্রজ প্রাণীদেহে যদি কোন বোরণ থাকে সেটা মাটিতে আসলে তাহা অতি সহজেই গাছের গ্রহণীয় হয়। মাটিতে চূণ দিলে বোরণ আর গাছের সহজ গ্রাহ্য থাকে না। মাটিতে চূণ দিলে অনেক সময় মাঠেতে বোরণের অভাব দেখা যায়।

বোরণের অভাবে গাছের নানা জাতীয় রোগ দেখা দেয়। বীট গাছে "হার্ট রট" গাজরে "ব্রাউন রট"। এর অভাবে গাছের আগা শুকিয়ে আসে, পরে গাছ মরে যেতে পারে। গাছের মূল আগায় যে কচি পাতা থাকে সেটা সহজে সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলে ও ফিকে সবুজ হয়। এ দিয়ে বোঝা যায় যে গাছের বৃদ্ধি থেমে গেছে এবং শীঘ্রই মরে যেতে পারে। গাছের বাকলে যে সমস্ত সরু রসির মত (tissue) থাকে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। গাছের প্রধান কাণ্ডের কুঁড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের পাতা পুরু হতে থাকে। গাছের উপরের দিককার পাতা মুড়ে যেতে পারে। যখন পাতার শিরা ও উপশিরাগুলি বেঁকে যায় তখন রঙ গাঢ় হয়ে যায়। আলফাল্‌ফা বা

লুসার্ণ, তামাক পাতায় বোরণের অভাব খুব তাড়াতাড়ি প্রকট হয়ে পড়ে। বোরণ গাছের খুব কমই দরকার হয়। বোরণ বললে অনেকে না চিনতে পারেন কিন্তু সোহাগা (Sodium bi-borate) বললে সবাই চিনবে। সোহাগা জলের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে মাঠে ছড়ালে মাটির বোরণ অভাব মিটবে।

লৌহ (Iron)

গাছের দেহেতে অন্য অপ্রধান ধাতুগুলির চেয়ে লৌহ কম থাকে। আপেল, শশা ও তরমুজে ৪ পি, পি, এম থাকে। কলা, গাজর, পেঁয়াজ, টমাটোতে ৪ থেকে ৮ পি, পি, এম বীটে এদের থেকে একটু বেশী আর পালং শাকে থাকে সব থেকে বেশী প্রায় ১৬ পি, পি, এম।

মাটিতে অনেক সময় লৌহ বেশী থাকে। সেখানে এর স্থান তৃতীয়। সাধারণতঃ লোনা মাটিতে যেখানে pH ইউনিট ৭ এর কাছাকাছি সেখানে লোহার অভাব দেখা যায়। মাটিতে গাছের গ্রহণযোগ্য লৌহ খুব কমই থাকে। লাল মাটিতে নীচের স্তরে লৌহের পরিমাণ খুব বেশী থাকে।

গাছের সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল তৈরী করতে লৌহ সাহায্য করে। কিন্তু ক্লোরোফিলের মধ্যে ১ পি, পি, এমও লৌহ থাকে না। এর কাজ সাহায্য করা। এই লৌহের অভাবে পাতায় জল নিষ্কাষণ কার্য্য (chlorosis) সমাধা হয় না। এ ভিন্ন লৌহের আর একটী কাজ আছে নিজের উপস্থিতি দিয়ে গাছকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করা। অম্ল মাটিতে প্রায় সব সময়ই পরিমাণ মত লৌহ থাকে আয়রণ অক্সাইড আকারে (Fe_2O_3) কিন্তু যেখানে মাটিতে সহজে দ্রবণীয়

ফসফেট ছড়ান হয় সেখানে লৌহ অদ্রবণীয় আয়রণ ফসফেট আকারে গাছের গ্রহণযোগ্য হয় না।

তামাক গাছের এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আজও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া অন্যান্য সব গাছের এর প্রয়োজন আছে। এর অভাবে ক্লোরোসিস বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পাতায় সবুজ রঙ আর থাকে না। সাধারণতঃ গাছের কচি পাতায় এর অভাবের লক্ষণ প্রথমে ফুটে উঠে। কুঁড়ির পাতায় এর লক্ষণ দেখা গেলে পাতার শিরা ও উপশিরাগুলি সাদা হয়ে যায়। অনেক সময় সমস্ত পাতাই সাদা হয়ে যেতে পারে। তবে প্রধান শিরা অনেকদিন সবুজ থাকে। লৌহের অভাবে পাতা সাদা হয়ে গেলেও পাতা ঝরে নাও পড়তে পারে বা গাছ নাও মারা যেতে পারে। গাছ অনেক সময় মারাও যায় না। যদি মাটিতে ম্যাঙ্গানীজ ও তামার পরিমাণ একটু বেশী হয় তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে গাছ লৌহ টানতে পারে না। কারণ তামা তাকে বাধা দেয়।

ম্যাঙ্গানীজ

বেলে মাটিতে যেখানে খুব বেশী চোঁয়ানি সম্ভব সেখানে ম্যাঙ্গানীজের অভাব দেখা যায়। তা বাদে সমুদ্রের ধারের মাটিতে, লোণা মাটিতে এর অভাব দেখা গেছে। মাটিতে ম্যাঙ্গানীজ ধ্বণাত্মক ধাতব পদার্থ হয়ে অবস্থান করে এবং প্রাথমিক ও দ্বিতীয়জ (Secondary) যে কোন ধাতব পদার্থের সহিত মিশতে পারে। মাটি অম্লতর হলে ম্যাঙ্গানীজ বেশী মাত্রায় জলে দ্রবণীয় হয়। মাটিতে চূণ দিলে ম্যাঙ্গানীজ আর জলে মিশে গাছের গ্রহণীয় থাকে না।

গাছের দেহেতে ম্যাঙ্গানীজের কাজ অনেকটা লৌহের মত।

গাছের সবুজকণা তৈরীতে সাহায্য করা। ম্যাঙ্গানীজ মাটিতে পরিমাণে একটু বেশী থাকলে এর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধা পায়। এর প্রধান কাজ গাছের টিস্থতে অক্সিজেন কম বেশী না হয় ও তার সমতা রক্ষা করা।

তামাক পাতা এর অভাবে সবুজ রঙ হারিয়ে ফেলে। ফলে কোন কোন টিস্থ মরে যায় ও গাছ বেঁটে হয়ে যায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি থাকে না। ফলে তামাক পাতার গন্ধ থাকে না। যই এর পাতা হলদে হয়ে যায়। আলু গাছের পাতা ক্লোরোসিস্ হয়ে চুপসে যায়। ফলে পাতাগুলি লাল বা হলদে হয়ে পড়ে। একরে ৬০ পাঃ ম্যাঙ্গানীজ সালফেট যথেষ্ট।

তামা

কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে মৃৎ বিজ্ঞানীদের কোন বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে এর সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। লেবু পাতার "ডাইব্যাক" রোগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এর প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত গাছ লাইন করে পোঁতা হয় সে সমস্ত গাছে তামার অভাব দেখতে পাওয়া যায়।

বেলে মাটিতে তামার অভাব থাকে। মাটিতে ঝারির মধ্য দিয়ে ছড়ালে ভাল হয়। যে মাটিতে অম্লতা একটু বেশী সে মাটিতে তামা মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ সহজেই দ্রবণীয়।

সার চয়ন ও ব্যবহার বিধি

আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের প্রচলন অতি আধুনিক। প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ সরকারী কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এর পরীক্ষা চলে এলেও কৃষকের মাঠেতে ধান, পাট ও অন্যান্য শস্যোৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ১৯৪২ সালের আগে একেবারে ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ সারের দোকানে নানা রকমের সার পাওয়া যায়। তা বাদে অনেক সময় বেনের দোকানেও রাসায়নিক সার বিক্রী হয়। এমোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, হাড্ডি সার, মিশ্র সার (এমোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেটের সঙ্গে কিছু পরিমাণ শ্লাজ বা সহরের আবর্জ্জনা সারের তলানি বা কাদামাটি মিশিয়ে তৈরী করা), এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের কাছেও বিভিন্ন সারের পার্থক্য ধরা পড়ে গেছে, কারণ তাঁরা দেখেছেন লবণ সার বা এমোনিয়াম সালফেট মাঠে ছড়িয়ে গাছের উদ্ভিজ্জ সংস্থান বেড়েছে বই কমে নি। এর জন্য আমাদের দেশের কৃষকেরা মাঠেতে এই লবণ সার ছড়াতে খুবই আগ্রহশীল। এ ভিন্ন শীতকালে যে সমস্ত সব্জী উৎপাদন করা হয়, সেগুলিতে অনেকে হাড়ের গুড়া বা নানা বীজজাত খইল গুড়া মিশিয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। কৃষকের লক্ষ্য থাকে উৎপাদনের দিকে, সুতরাং যে সার মাঠেতে আশু বেশী ফসলোৎপাদন করতে পারে না সে সার সে মাঠেতে ছড়াতে রাজি নয়।

সাধারণ মানুষের ও কৃষকদের দিন দিন এ সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ছে। আজ আর চাষী সারের গুণসম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হয়ে মাঠে সার ছড়াতে রাজি নয়, কারণ লবণ সারের গুণ তারা নিজের চোখে দেখেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে তারা স্থির নিশ্চিত হয়েছে যে এই সার মাঠেতে দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। ফলে এই সারের চাহিদা বেড়েছে এবং এই সঙ্গে সঙ্গে কিছু মিশ্র সারের চাহিদা বেড়েছে। অন্য যে সমস্ত মাটি সার (superphosfate) বা রঙীন সার (ammonium sulfate nitrate) বাজারে বিক্রীর জন্য মজুত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের আদৌ ঔৎসুক্য নেই।

জমির মালিকই হউক, চাষীই হউক এমন কি সাধারণ লোকই হউক সবাই চান যে মাঠের উৎপাদন বাড়ুক। সবাই চায় উৎপাদন বৃদ্ধি কিন্তু বিশেষ নজর রাখতে হবে আপাততঃ যে বৎসর সার যোগ করা হলো সে বৎসর উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও পরে যেন আবার উৎপাদন না কমে যায়। অনেক কৃষকই বলেন যে মাঠে একবার বিলাতী সার যোগ করলে পর বৎসর যদি ঐ সার আবার না দেওয়া যায় তবে তাতে আর ভাল ফসল হবে না। এটা সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কারণ কোনটাই অসম্ভব নয়। আমাদের দেশের মাটিতে অম্লতার পরিমাণ pH ৫.২। যদি পর পর দুই বৎসর কৃষক মাঠেতে এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করেন তবে নিশ্চয়ই মাটির অম্লতার পরিমাণ বেড়ে যাবে ও pH ইউনিট কমে যাবে। কারণ আমরা ত জানি এমোনিয়াম সালফেট মাটিকে অম্লতর কোরে তোলে। ২ বৎসরে ½ ইউনিট pH কমে যাওয়া যে কোন জাতীয় মাটির পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং কোন একটী ফসল যেটা মাঠের pH ৫.২ ইউনিটে বেশী উৎপাদিত হয়েছে সেই ফসল pH

কমে গেলে বেশী পাওয়া যাবে না। সুতরাং কৃষক বিলাতী সারকে দোষ দিয়ে চোখের জল ফেলে ঘরে উঠেন।

মাঠেতে সার ছড়াতে গিয়ে কতকগুলি বিষয় ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। এর জন্য প্রথমেই জানা দরকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, সেই স্থানের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, সেইখানকার মাটি এবং সেই মাটিতে কি ফসল করা হবে।

মাটি ঃ—

মাটির বৈষম্য সর্ব্বত্র। একই খেতের একদিককার মাটি মাঠের অন্য দিককার মাটি থেকে পৃথক। মাটি ভিন্ন এই পৃথিবীতে এমন কোন স্তর আবিষ্কার হয়নি যেখানে গাছপালা বাড়তে পারে বা ফসল ফলান যায়। সুতরাং মাটি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে কোন কিছুই করা যেতে পারে না। মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান বলতে বুঝায় মাটির বাহিক (physical) এবং রাসায়নিক গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়া। কোন বেলেমাটিতে যদি আমন ধান করা যায় তবে নিশ্চয়ই সেখানে আমন ধান ভাল হবে না। আবার উঁচু মেটেল মাটিতে যদি পাট করা হয় তবে সেখানে ফসল হবে অতি সামান্যই। আমাদের দেশের কৃষকের মাটি সম্বন্ধে এই সাধারণ জ্ঞানটুকু আছে। এ ছাড়া আরও একটী জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায যে একই রকম মাটিতে একই রকম সার দিয়ে বিভিন্ন পরিমাণে উৎপাদন পাওয়া গেছে। সুতরাং সব থেকে প্রয়োজন মাটির বিশ্লষেণ করে তার স্বরূপটী জানা। প্রথমতঃ ধরা যাক মাটিতে বালু বা কাদামাটির পরিমাণ জানা থাকলে ভাল হয়, তা বাদে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিকে বিশ্লেষণ করে গাছের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির অবস্থানের পরিমাণ জানা যায় তবে

খুবই ভাল হয়—(N-P-K-OM-H)। এটা জানার পর ঠিক করতে হবে যে মাটিতে কি পরিমাণ ঐ দ্রব্যগুলি আছে।

ফসল

এক একটী ফসল এক একটী বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ বেশী করে টেনে নেয়। তার ফলে মাটিতে সেই সারটীর পরিমাণ কমে যায়। বছরের পর বছর একই খেতে একই ফসল করলে সেই ফসল যে সারটী বেশী ভাবে টানবে সেই সারটি কমে যায়। এবং তার ফলে উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। আমাদের দেশে একটু উঁচু বেলে দোয়াশ মাটিতে পাট বা আউস ধান করা হয় বা নীচু জমিতে আমন ধান করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বৎসর একই ফসল হয়ে চলেছে। সুতরাং মাঠ থেকে একই পরিমাণ সার গাছের মাধ্যমে উঠে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে এই ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা হলেও, যদিও এর আংশিক ক্ষয় নিবারণ হয় তবুও এর সব চাহিদা মেটে না। নাইট্রোজেন প্রতিটি গাছের দরকার। কারণ এটা ভিন্ন গাছের ভাল বাড় হয় না। তা বাদে নাইট্রোজেন দিয়ে গাছের দেহেতে প্রোটিনের সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশের মাটীতে দেখা যায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম কিন্তু গাছ যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে তার পরিমাণ কম নয়।

গাছের ফসফরাস দরকার এবং N_2 তুলনায় খুব কমই। এটা অনেক সময় গাছ মাটি থেকে পায়। লেগুমিনাস জাতীয় গাছের যেমন লুসার্ণ, ক্লোভার জাতীয় ইত্যাদির জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কারণ এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে এনে মাটিকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু যে সমস্ত ফসল মাটির তলে হয় আলু, বীট, গাজর ইত্যাদি জন্য নাইট্রোজেন কম দরকার হয়। এদের বেশী দরকার হয় পটাশ।

স্থতরাং কোন ফসল করা হবে এটা ঠিক করলে পর মাঠে কোন সার কতটা পরিমাণে দেওয়া হবে তার নিরূপণ হয়ে থাকে।

আমাদের দেশেতে সাধারণতঃ দুই রকমের ফসল করা হয়। একটী অর্থকরী ফসল—যেমন পাট তূলা ইত্যাদি। অন্যটী খাদ্য জাতীয় ফসল—যেমন গম, ধান, ভুট্টা, ইত্যাদি। প্রাণী নিয়ে ব্যবসা আমাদের দেশে খুবই কম হয়। অর্থকরী ফসলই হোক আর খাদ্য জাতীয় ফসলই হোক মাঠ থেকে ফসল কেটে তোলার সাথে সাথে গাছের বা ফসলের দেহের মাধ্যমে মাঠ থেকে গাছের টেনে নেওয়া রাসায়নিক পদার্থগুলি চলে যায়। যদি এক একর জমিতে ধান করা হয় তবে ফসল ও গাছের ওজন যদি ১ মেট্রিক টন হয় তবে ১৫৫ পাঃ নাঃ, ৩২ পাঃ ফঃ, এবং ১১১ পাঃ পঃ একটী মাত্র ফসলে মাঠ থেকে চলে যাবে। কিন্তু গমেতে একরে মাত্র ৫০ পাঃ নাঃ, ১৯ পাঃ ফঃ, ও ২৬ পাঃ পটাশ নষ্ট হয়। কেবলমাত্র বৎসরের পর বৎসর নয়; একই বৎসরের দুইটী ধানের ফসল তোলার রীতি আমাদের দেশে আছে। এ দিয়ে দেখা যায় আমাদের দেশের মাঠ থেকে কি পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ চলে যাচ্ছে। মাটির এই যে ক্ষয় এই ক্ষয় আর সম্পূর্ণরূপে পূরণ হচ্ছে না।

মটর (কলাই) এক একর জমিতে ৪ টন ৩০ পাঃ নাঃ ২০ পাঃ ফঃ ৪৫ পাঃ পঃ। এক একর জমিতে অন্য মটর ১ টন গাছ ১৫৩ পাঃ নাঃ ৩০ পাঃ ফঃ ৭২ পাঃ পঃ।

দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র কলাই ফসল ও গাছের মাধ্যমে কি পরিমাণ সার মাটি থেকে উঠে যাচ্ছে। যদি ঐ গাছগুলিকে কোন রকমে মাটির সহিত মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে ইহা মাঠের পক্ষে খুবই কাজের হয়। কারণ তাহলে ঠিক ঐ পরিমাণ সার মাঠেতে যোগ করা হয়। যখন ফসল মাঠ থেকে কেটে তোলা হয় তখন গাছের ডাঁটাগুলি

পেকে যায়। এদের পচতে বেশ সময় লাগে। তা বাদে যে সময় শস্য আহরণ করা হয় সে সময় মাঠেতে জলের বিশেষ অভাব।

মাঠেতে কোন ফসল করা হবে ঠিক হয়ে গেলে তখন ভাববার প্রয়োজন হয় কোন সময়ে ফসল উৎপাদন করা হবে। কারণ যদি শীতকালীন সব্জী বা কোন ফল পাকড় করতে হয় তবে প্রথম আমলে বাজারে বিক্রী করতে পারলে ভাল পয়সা পাওয়া যাবে। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে এর দাম কমে যায়। সুতরাং কোন ফসল যদি আগে তুলতে হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন আশু বীজ। তারপরে একে আরও তাড়াতাড়ি করা যায় কিছু সার দিয়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় মাটিতে পরিমাণ মত সুপার ফসফেট দিয়ে আগেই ফসল ঘরে তোলা গেছে। তা বাদে বাজারে যে সমস্ত বীজ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কোন কোন বিশেষ ধরণের বীজ আছে যারা ঠিক সময়ের আগে বপন করলেও আগুতে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কৃষকের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সব জিনিষের দাম সব সময় একই থাকে না। শীতকালে যখন চাল বাজারে প্রথম বিক্রী হতে আসে তখন তার দাম থাকে খুব কম, কারণ কৃষকদের জিনিষের পরিবর্ত্তে টাকার প্রয়োজন হয়। সব থেকে বেশী দাম ওঠে বাজারে ভাদ্র মাসে। কারণ এই সময় কোন চাউল জাতীয় ফসল এদেশে পাওয়া যায় না। আশ্বিন মাসের প্রথমে আউস ধান বাজারে বিক্রী হতে আরম্ভ করে কিন্তু এতে বাজারের চাহিদা মিটাতে পারে না। আমাদের দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে চাউলের দাম কমে সামান্য টাকায় এসে দাঁড়ায়। সেখানে মাটিতে কোন সার দেওয়াই বাহুল্য। এর কারণ হলো প্রথমতঃ পথ ঘাটের অসুবিধা ও দ্বিতীয়তঃ আমদানীর পরিমাণ বেশী

প্রয়োজনের থেকে। সেখানে ক্রেতা নেই, সেখানে কেবলমাত্র ধান চাষ না করে অন্ততঃ নিজের প্রয়োজন মত কোন কোন জমিতে কোন অর্থকরী ফসল করা বাঞ্ছনীয়।

বাজারে যে সমস্ত সার পাওয়া যায় তার মধ্যে কোনটিতে গাছের খাদ্য কি পরিমাণ আছে জানা দরকার। সেটা জানা না থাকলে কৃষককে ঠকতে হবে। এটা জানতে খুব বেশী কষ্টও নেই। লবণ সার বা এমোনিয়াম সালফেটে সাধারণতঃ শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে অর্থাৎ যদি ৫ মণ সার কেনা থাকে তার থেকে নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে মাত্র ১ মণ। এই যে সাধারণ জ্ঞান সার সম্বন্ধে এটা কৃষককে ভালভাবে জানতে হবে। সুপার ফসফেটে শতকরা ১৫ ভাগ ফসফরিক এসিড থাকে। সুতরাং মাঠেতে ৬⅔ মণ এই মাটি সার দিলে মাঠেতে কেবলমাত্র ১ মণ ফসফরিক এসিড যোগ করা হবে। এ ভিন্ন বাজারে মিশ্র সার কিনতে পাওয়া যায়, সরকার থেকে এই সার বিক্রীর ব্যবস্থা আছে। এরও অনুপাত বিক্রেতার কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। যদি এই দোকানী সারের অনুপাত না বলতে পারে তবে বোরার গায় নিশ্চয়ই লেখা থাকবে। এ ভিন্ন হাড্ডি সারের প্রচলন আছে এবং প্রয়োজনানুযায়ী হওয়াও উচিত। কারণ যে মাটিতে অম্লতা একটু বেশী অর্থাৎ pH ৫.২ ইউনিট বা এর থেকে একটু কম সেখানে এই হাড়ের গুড়া যোগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এতে শতকরা কম বা বেশী ২০ ভাগ ফসফরিক এসিড থাকে ও শতকরা কম বেশী ৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তবে অনেক সময় দেশীয় প্রথায় তৈরী করলে এদের পরিমাণ কমে যায়।

সারের কৃষিতে মান

যে সার মাটিতে যোগ করে বেশী ফসল পাওয়া যায় সেই সারই কৃষকের কাছে শ্রেয়। অন্য সার নয়। কিন্তু কেবলমাত্র একটী সার যোগ করে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায় না। তা বাদে এই সার মাঠেতে ছড়াতে গিয়ে দেখতে হবে মাটি ও তার আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সেখানকার উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি। সাধারণতঃ কোন সারের কৃষিকার্য্যের উপকারিতা নির্ণয় করতে গিয়ে কৃষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবতে হবে।

(১) বিভিন্ন ফসল একই সার বিভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করবে। ঠিক এই সময়ে কৃষককে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

(২) উত্তাপ ও তার পরিমাণ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি যে নৈসর্গিক উপায়গুলি ফসল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেগুলি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। এগুলি সাধারণতঃ সরকারী অফিস থেকে পাওয়া যায়। তা বাদেও খবরের কাগজে দৈনন্দিন আবহাওয়ার কথা লেখা থাকে, আর জল না হলে তো ফসলই হবে না। কারণ আমাদের দেশে জলই সব থেকে বড় সার। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার।

(৩) কিভাবে মাঠের জল নিষ্কাশন হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষতঃ যেখানে সার দেওয়া হবে। কারণ জলের সহিত মিশে বহু পরিমাণ সার মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে। যদি মাঠে এমোনিয়াম সালফেট ছড়ানোর পরই

খুব বেশী বৃষ্টি হয় তবে এমোনিয়াম সালফেট জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে।

(৪) মাটিতে কোন রাসায়নিক সার জাতীয় পদার্থ কি পরিমাণে আছে—কার্বণ জাতীয় বা জৈব পদার্থের পরিমাণ কত। এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। মাঠেতে কয় বৎসর আগে চূণ দেওয়া হয়েছে, অম্লতার পরিমাণ কি? আর চূণ দিতে হবে কি না ইত্যাদি বিশেষ ভাবে জেনে নিতে হবে। সবার উপর ফসলের পর্য্যায় জানতে হবে (Rotation)।

মাটির আকৃতি ও প্রকৃতির উপর সার নির্ব্বাচন ও তার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। বালুমাটিতে জল পড়লে অতি তাড়াতাড়ি সে জল নীচে চলে যায়। সুতরাং এই জমিতে যদি এমন কোন সার দেওয়া যায় যাহা অতি সত্বর জলের সহিত মিশবে তবে সে সার তাড়াতাড়ি মাটির নীচে চলে যাবে ও সে খাদ্য আর গাছের গ্রহণীয় থাকবে না। ফলে মাটিতে সার দেওয়া বিফল হয়ে যেতে পারে। যেমন বালু মাটিতে যদি সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট যোগ করা যায় তবে তার থেকে কোন সুফল আশা করা ভুল হবে। কারণ নাইট্রেট অতি সত্বর জলের সহিত মিশে, হয় মাটির নীচে চুইয়ে যাবে কিম্বা স্রোতের মুখে পড়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে। কোন মতেই বেশী বৃষ্টির সময় মাঠে নাইট্রেট সার দিতে নেই, এতে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। যদি সার দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে মাঠেতে যতটা সার ছড়ান হবে তার ½ ভাগ প্রথমে মাঠে ছড়াতে হয়। তারপর বাকি অংশ মাঠ শুকালে ছড়াতে হয়।

যে মাটিতে কাদার ভাগ শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের মধ্যে সে মাটিতে বেশী ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এর বেশী কাদার

অংশ হলে মাটিতে ভাল হাওয়া খেলতে পারে না ও জল চলাচলের ব্যাঘাত হয়। তাতে কোন ফসল ভাল ভাবে করা বেশ কষ্টকর হয়। এতে সার দিলে কাদা মাটির মধ্যে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ থাকে সেগুলি সার থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ টেনে নিয়ে এমন কতকগুলি মিশ্র যৌগিক পদার্থ তৈরী করে যার ফলে গাছকে তার খাদ্য জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এর দ্বারা কিছুটা নাইট্রোজেনও নষ্ট হয় কিন্তু ফসফেট থেকে ফসফরিক এসিড টেনে বার করতে পারে।

মাটিতে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। সাধারণ কৃষকের রসায়ণ শাস্ত্রে জ্ঞান নেই। সুতরাং যে কয়টী পদার্থ তাদের প্রয়োজন সে কয়টীর রীতি, নীতি সম্বন্ধে কৃষকের সাধারণ জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের পরিমাণও বিভিন্ন। এর জন্য সরকারী গবেষণাগারে মাটির নমুনা পাঠিয়ে সরকারী বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর সাহায্য নেওয়া উচিত। যে মাটিতে বালু বেশী সেখানে বেশী পটাশ থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং বালু মাটিতে যে ফসলে বেশী পটাশ দরকার সেই ফসল করা বাঞ্ছনীয়। যে মাটিতে কাদা মাটির ভাগ বেশী সে মাটি তৈরী হয় সম্ভবতঃ ফেল্ডসপার থেকে। সুতরাং এতে সুপার ফসফেট একটু কম থাকতে পারে। কিন্তু যে মাটি চুণা পাথর থেকে উৎপত্তি হয়েছে তাতে চুণের ভাগ বেশী ও যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরিক এসিড থাকতে পারে। এতে প্রথমেই প্রয়োজন নাইট্রোজেন জাতীয় সারের।

আমাদের দেশের চাষীরা শীতকালীন সব্জীর জন্য এমোনিয়াম সালফেট বা লবণ সার ব্যবহার করেন। এদিয়ে তারা ফল ভালই পান। কিন্তু দুই এক বৎসরের মধ্যে অনেককে বলতে শোনা

যায় যে মাঠে সার দিয়েও ভাল ফল পাচ্ছেন না। সেজন্য মাঠে সার দিতে গিয়ে দেখতে হবে মাঠে তারা কোন সার দিয়েছিলেন। আর জানতে হবে আগের বৎসর বা পূর্ব্বে সেখানে কোন ফসল হয়েছিল এবং কৃষক কোন ফসল করার পক্ষপাতী। যে সমস্ত ফসল বেড়ে উঠার সঙ্গে মাটিতে নিড়েন দিতে হয় সে সমস্ত মাটিতে জলের সঙ্গে কিছু পরিমাণ সার মাটির নীচে চুইয়ে যেতে পারে। নাইট্রোজেন জাতীয় সার প্রতি বৎসর মাঠে দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু ফসফেট সার একবার মাঠেতে দিলে পর তিন বৎসর তার ফল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তিন গুণ স্থপার ফসফেটে তৃতীয় বৎসরে এসে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

সব সময়ই মনে রাখা উচিত মাটি একটী বিভিন্ন পদার্থ সমন্বয়ে রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত একটী যৌগিক পদার্থ। এর ফলে মাটিতে সার দিলে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। সবার উপরে ভুললে আদৌ চলবে না যে সবুজ সার বা জৈবিক আবর্জ্জনা সার দিয়ে অনেক সময় রাসায়নিক সার দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় তার থেকে বেশী ফল পাওয়া গিয়েছে।

রোটেশান—একই মাঠেতে একই ফসল বছরের পর বছর করা উচিত নয়। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মাঠেতে ৪ বৎসরের ফসলের মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসর কোন লেগুমিনাস জাতীয় ফসল করতে হবে আর প্রতি বৎসর যদি মাঠে সার দেওয়া হয় তবে অন্ততঃ ৬ বৎসরে একবার মাটে চুণ ছড়াতে হবে। আমাদের দেশের অন্ততঃ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে যে অবস্থা তাতে সেখানকার নীচু জমিতে ধান ভিন্ন অন্য কোন ফসল করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সুতরাং সেখানে কোন শস্য পর্য্যায় মেনে চলা কষ্টকর।

আজকাল মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকার ও দেশের জনসাধারণ সকলেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। কারণ কেবলমাত্র ২০।৩০ বৎসর আগে কোন জমিতে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যেত আজ আর সে পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় না। সেজন্য কেবলমাত্র সরকার ও দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে উঠেন নি দেশের কৃষককুলও মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছেন। সবাই ভাবছেন কি করে ফসলের পরিমাণ বাড়ান যায়। সার দিয়ে, ভাল বাছাই বীজ ছড়িয়ে, প্রকৃত যত্ন নিয়ে, গাছকে রোগমুক্ত করে কীট পতঙ্গের হাত থেকে বাঁচিয়ে কিছু পরিমাণে ফসল বাড়লেও সয়েল ব্যাঙ্কে টান পড়ে। কৃষকেরা লক্ষ্য রেখেছেন ৫০ বৎসর আগে মাঠের মাটি যে অবস্থায় ছিল আজ আর সে অবস্থায় নেই। সুতরাং আমাদের আশু প্রয়োজন "মৃত্তিকা সংরক্ষণ"। মৃত্তিকা সংরক্ষণ বলতে কেবলমাত্র ঢালু জমিকে ক্ষয় থেকে বাঁচান বোঝায় না। এর প্রধান অর্থ হলো মাটি থেকে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা না যায় (চেষ্টা অবশ্য সকল রকমে করা হচ্ছে) মাটির বর্ত্তমান যে উৎপাদন ক্ষমতা আছে সেটা যেন ভবিষ্যতে ঠিক থাকে। মাটির ক্ষয় সব রকমে হচ্ছে—বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া, বাতাসে মাটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, সবার উপর গাছ ও ফসলের মাধ্যমে মাটি থেকে গাছের খাদ্য তুলে নেওয়া। এসব আগেও ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো মাটির যেন আর কোন ক্ষয় না হয়। সুতরাং "মৃত্তিকা সংরক্ষণ বলতে কেবলমাত্র বাঁধ বাঁধা, গালি বোজান, পাহাড়ের ধার কেটে সিঁড়ির মত করে খেত তৈরী করা বোঝায় না। মৃত্তিকা সংরক্ষণ বলতে বোঝায় যাতে মাটির আর ক্ষয় না হয় বরং উত্তরোত্তর মাটির শ্রীবৃদ্ধি হয় ও খেতের উৎপাদন বাড়ে।

খেতের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মাঠের

উদ্ভিজ্জ পচা কার্বণজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়ান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র কার্বণ জাতীয় পদার্থ মাঠের উৎপাদিকা শক্তির সমতা বজায় রাখতে পারবে না। আমাদের দেশ উষ্ণ মণ্ডলে। সুতরাং প্রখর সূর্য্য তাপে এই সমস্ত আবর্জ্জনা জাতীয় সার পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এর সমতা রক্ষা নির্ভর করে কিছুটা মৃত্তিকা কর্ষণের উপর। লাইনে বপন করে এর সমতা কিছুটা রক্ষা করা যায়। আর রক্ষা করা যায় রোটেশান পদ্ধতিতে। ভুট্টা, যই, লুসার্ণ কিম্বা শষ্য, যই, ক্লোভার, কিম্বা ভূট্টা, যই ও ক্লোভার।

রোটেশান সম্বন্ধে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। ঘাসাচ্ছাদিত জমিতে বা যে জমিতে শুকনা পাতা পড়ে পচে সেখানে কার্বণ জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। দেখা যায় সেখানে বছরের পর বছর ভূট্টা ফসল করে জৈব দ্রব্যের পরিমাণ মাটিতে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। সেখানে এর পরিমাণ বাড়ানো যায় যদি প্রতি তিন বছরে একবার মাঠেতে ক্লোভার ফসল করা হয়। আর সেই ক্ষয়ের শতকরা ৯০ ভাগ পূরণ হয় যদি প্রতি ৪ বৎসরের অন্ততঃ পর পর ২ বৎসর মাঠে আলফালফা বা লুসার্ণ বোনা যায়।

ভূট্টা, গম ও ক্লোভার ফসল করে ২৪ বৎসর পর দেখা গেছে যে মাটির এই কার্বণ জাতীয় পদার্থ খুব বেড়ে গেছে। এ দিয়ে ২৪ বৎসরে ৮৭০ পাঃ নাইট্রোজেন মাঠে যোগ হয়েছে।

রোটেশান পদ্ধতির স্থূল কথা এই যে অন্ততঃ প্রতি ৪ বৎসরের ফসলের মধ্যে এরকম কোন লেগুমিনাস জাতীয় ফসল করার প্রয়োজন। এর ফলে মাটিতে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজেন ও কার্বণ জাতীয় পদার্থ যোগ করা হবে। তা হলে মাঠের মাটি থেকে যে পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ক্ষয় হয়েছে সেটুকু পূরণ হয়ে যাবে।

কেবলমাত্র ফসল পরিবর্ত্তন করে মাঠের উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা যায় না। কারণ মাঠের অম্লতার সমতা ও ফসফরাস এর পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরকার। তবেই মাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রথম জানার দরকার মাটি কি পরিমাণে নাইট্রোজেন হারালো, ফসল বিশ্লেষণ করে পরিমাণ জানা যেতে পারে। বাজারের রাসায়নিক সার ও সবুজ সার যোগ করে এই ক্ষয় অনায়াসে পূরণ করা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে ফসফরাস ক্ষয় পূরণ করা যায় না। সুতরাং বাজারের সার দিয়ে সে ক্ষতি পূরণ করা ভিন্ন অন্য কোন ভাল উপায় আর নেই। মাটি পরীক্ষা করে পরিমাণ মত পটাসিয়াম মাঠে ছড়ান প্রয়োজন। এই সমস্ত সার ও মাঠের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুকূল হওয়া সত্বেও যদি মাঠের ফসল আশানুরূপ না হয় তবে পরিমাণ মত অপ্রধান ধাতব পদার্থগুলি মাঠেতে ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

যে মাটিতে যত কাদামাটি বেশী সে মাটির ক্ষয়ও তত বেশী। এই রকম মাটিতে লেগুমিনাস জাতীয় ফসল ও পরে ঘাস বপন করা উচিত। যেখানে বা যে মাটিতে কিনারায় সিঁড়ির মত ধাপ কেটে (contour terracing) বা উপযুক্ত ভাবে লাঙ্গল চালিয়ে যদি মাটির ক্ষয় নিবারণ করা না যায় তবে ভূট্টা, যই, লুসার্ণ (৩ বৎসর) রোটেশান প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা মাঠেতে সাধারণতঃ দু রকমের ফসল করি। একটা বলা যায় নগদ পয়সার কৃষি, অপরটিকে বলা যায় পশু পালন কৃষি। আমাদের দেশে জমি কম। এ ছাড়া প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তা বাদে সবাই চায় ফসল বিক্রী করে কিছু নগদ পয়সা হাতে আসুক। সুতরাং ফসল পরিবর্ত্তন করা বা রোটেশান কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে

উঠছে না। অন্যান্য দেশের কৃষকও ঠিক মত রোটেশান পালন করেন না। যদি তিন বৎসরের রোটেশান করতে হয় তবে মাঠের ⅓ অংশ উলটে পালটে ফসল করলে তো হাঙ্গামা চুকে যায়। কিন্তু যেখানে সবুজ সারের ব্যাপার থাকে সেখানে দেখা যায় কৃষক শেষ পর্যন্ত ফসল বিক্রী করে দিয়ে মাঠের অশেষ ক্ষতি করেছেন। পশু পালন পদ্ধতিতে অবশ্য এরকম কোন ভয় থাকে না কিন্তু কৃষক সব সময় ঠিক আবর্জ্জনা সার মাঠে ছড়াতে পারে না।

মৃত্তিকা সংরক্ষক বিজ্ঞানীরা পশু পালন পদ্ধতির অনুমোদন করেন। কারণ দেখা যায় যে অনেক ফসল মাটির অবয়ব (sructure) ভেঙ্গে দেয় ফলে মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়। বিশেষতঃ যদি মাঠে সোয়াবীন করা হয় তবে মাটি আলগা হয়ে পড়ে ও ভয়ানক ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে।

সার প্রয়োগ বিধি

হাতে ছড়ান—(Broadcasting) এই পদ্ধতি খুবই সহজ। হাতে করে মাঠেতে ছড়িয়ে দেওয়া। যেমন করে ধানের বীজ মাঠেতে ছড়ান হয় তেমনি করে মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে মই দিয়ে কি নিড়ানি দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। অনেকে আবার কোন পদ্ধতিতে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন না ছড়িয়েই খালাস। এভাবে মাঠেতে সমান ভাবে সার ছড়ান সম্ভব কতকটা পরিমাণে। এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম ক্লোরাইড, স্থপার ফসফেট, মরিয়েট অব পটাশ, হাড্ডি সার প্রভৃতি এভাবে ছড়ান যেতে পারে। এতে বীজের কোন ক্ষতি হয় না। তবে যদি কোন বীজ ফসফেটের উপর পড়ে তবে সেই বীজটী নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যখন মাঠেতে খুব বেশী পরিমাণ সার দিতে হয় তখন এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না।

লাইনে সার দেওয়া—(Line application)—যে সমস্ত ফসল লাইনে করা হয় সে সমস্ত ক্ষেতে লাইনে সার ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। দুই লাইন গাছের মাঝখানের জমিতে লাইন বরাবর ১" কি ২" মাটির নীচে সার দেওয়া হয়। এতে কম সার খরচ হয়। অনেক সময় বীজের চারিদিকে বৃত্তাকারে ২" বা ৩" দূরে সার দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কোন একটা দিক দিয়ে সারের কোন তারতম্য হয়নি। লাইনে সার দিয়ে যেমন সারের প্রয়োজন কম হয় তেমনি গাছের এই সার গ্রহণের সুবিধা হয়। সার নিয়ে যখন সব গাছের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তখন সারগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে মাটির মধ্য দিয়ে। ফসফেট সার লাইনে ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। বিশেষতঃ পাট যখন লাইনে করা হয় তখন লাইনে ফসফেট দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গাছ বেড়ে উঠলে মাটিতে সার দেওয়া (top dressing)—যাঁরা খেতি করেন তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, ফলের গাছে ও যে সমস্ত ফসল ঘরে তুলতে বৎসরেরও বেশী সময় লাগে সে সমস্ত গাছের মাটির উপরে সার দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। কিন্তু যে সমস্ত ফসল বৎসরের কম সময় লাগে সে সমস্ত ফসলে মাটি তৈরী করার সময় ও গাছের ফুল ধরবার কিছু আগে মাঠেতে সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাটির নীচে চুইয়ে খুব কম সার নষ্ট হয়। কারণ গাছ তখন বেশ বেড়ে উঠেছে এবং তার শিকড় মাটির নীচে ছড়িয়ে গেছে। সুতরাং মাটি থেকে তাড়াতাড়ি সেই খাদ্য গ্রহণ করা গাছের পক্ষে অসুবিধা হয় না। ছোট একটী বালককে ৮টী রসগোল্লা দিলে সে খেতে পারে না। কিন্তু ২০ বৎসরের একটি যুবক ৮টী রসগোল্লা দিলে সে অনায়াসে খেয়ে নেবে। এটাও ঠিক সেই

রকম। গাছ বেড়ে উঠলে মাটিতে যে সার দেওয়া হয় সেটা তিন রকমে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ গোড়া একটু কুপিয়ে তাতে জল দেওয়া দ্বিতীয়তঃ একটা গর্ত্ত করে গাছের চারিপাশে তার মধ্যে সার দিয়ে দেওয়া তৃতীয়তঃ লাইনে সার দেওয়া। এইভাবে মাঠে সার দিতে গিয়ে নজর রাখতে হবে যে গাছের পাতা বা ডাঁটা সরা-সরি সারের সংস্পর্শে না আসে তা হলে গাছের ক্ষতি হতে পারে।

কেন্দ্রীভূত সার স্থাপনা। (Localised)

ভূট্টাজাতীয় কতকগুলি শস্য লাইন করে বীজ বপন করা হয়। যে কোন রকমের সীড ড্রল দিয়ে এগুলো করা সোজা। ঠিক এই বীজের ১" নীচে যদি এই সার দেওয়া যায় তবে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সাথে সাথে বীজের মধ্যে যে খাদ্য থাকে গাছ সেগুলি থেকে খাদ্য পায়। যেমন ছোট ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবার পর খাদ্য পায় মায়ের কাছ থেকে। ঠিক এর পর যখন বাহির থেকে খাদ্য প্রয়োজন হয় তখন যদি নিকটে কিছুটা খাদ্য পায় তবে সতেজ ভাবে বেড়ে উঠতে পারে। শুধু যে সতেজ ভাবে বেড়ে উঠে তাই নয়। এ দিয়ে ফসলও বেশী পাওয়া যায়। কারণ ঠিক নীচেই খাদ্য পেলে গাছকে আর বেশী কষ্ট পেতে হয় না। সীড ড্রিল দিয়ে এটা করা অতি সহজ। যদি সীড ড্রিল না থাকে তবে লাঙ্গলের ফলা দিয়ে গর্ত্ত করে সেই গর্ত্তে পরিমাণমত সার দিয়ে উপরে মাটি দিয়ে বীজ ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজ সোজাসুজি সারের সংস্পর্শে না আসে। বীজ যদি সারের সংস্পর্শে আসে তবে সে বীজের আর অঙ্কুরোদ্গম হবে না। এই ভাবে কোন একটি সার বা মিশ্র সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কেবলমাত্র হাতে ছড়িয়ে যে ফসল পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে অন্ততঃ দেড় গুণ পরিমাণ বেশী ফসল পাওয়া যাবে লাইনে কেন্দ্রীভূত সার দিয়ে। আর ভূট্টা ইত্যাদি ফসলে কেন্দ্রীভূত সার দিয়ে দেখা গেছে যে ফসল প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাট চাষেও আমাদের দেশে লাইনে করে দেখা গেছে যে ফসল প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা বাদে সুপার ফসফেট সার লাইনে বা কেন্দ্রীভূত স্থাপনা করে দেখা গেছে যে এই সার মাটির সহিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতি সত্বর গাছের গ্রহণীয় হয়। সুপার ফসফেট এক স্থানে মাটিতে দিলে এতে যে সমস্ত ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে তারা চারিদিককার মাটির সংস্পর্শে আসবে ও মাটির সহিত মিশে গাছের খাদ্য তৈরী করবে। কিন্তু এই সারের মাঝখানের অংশ তখনও অবিকৃত থাকে। পাশের সার নূতন নূতন জিনিষ তৈরী করার সাথে সাথে মধ্যকার সার অন্য মাটির সহিত মিশতে সময় পায়।

এ ভিন্ন আরও কয়েকটী পদ্ধতি আছে যা দিয়ে মাটিতে সার দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ ও বেশী পরিমাণ ফসলের জন্য নীচের পদ্ধতিগুলি কার্য্যকরী।

(১) মাটির নীচের স্তরে সিরিঞ্জ বা ঐ প্রকার কোন যন্ত্র দিয়ে সার দিয়ে দেওয়া। কোন যন্ত্র দিয়ে মাটি খুড়েও দিয়ে দেওয়া যায়। top dressing সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আগেই বলেছি যে গাছের চারিদিকে সার ছড়িয়ে দিতে হয়। এখানেও ঠিক সেই রকম। গাছের চারিদিকে বৃত্তাকারে গর্ত্ত খুড়ে তার মধ্যে সার দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখা উচিত কোন শিকড় যেন না কেটে যায়। সেজন্য যথা সম্ভব দূরে এই গর্ত্ত করা উচিত। সারের পরিমাণ আগেই ঠিক

করে নেওয়া উচিত। কোন একটী বিশেষ গাছের জন্য আধ-সেরর বেশী সার দিতে হয় না, কিন্তু যদি মিশ্র সার হয় তবে একটু বেশী পরিমাণে দেওয়া উচিত। লাল কাঁকুরে মাটিতে যেখানে লেবু গাছে লেবু হয় না সেখানে হাড্ডি সার বা সুপার ফসফেট এভাবে দিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁঠাল গাছে এভাবে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

(২) অনেক সার আছে যেগুলি অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যায়। সেগুলি জলের সহিত মিশিয়ে মাটিতে দেওয়া যেতে পারে। ইউরিয়া অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যায়। তা বাদে বর্ষাকালে বাতাস থেকে জলকণা টেনে এনে ডেলার আকার নেয়। এই সময় এগুলিকে ছড়ান বিশেষ কষ্টকর হয়ে পড়ে। অথচ জলের সহিত মিশায়ে অতি সহজে ছড়ান যেতে পারে। কিন্তু সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের পাতায় বা ডাঁটায় যেন এসে না লাগে। বালতিতে জল নিয়ে যে পরিমাণ ইউরিয়া মেশান হবে সেইটাই যদি কোন একটী বিশেষ গাছকে দেওয়া হয় তবে সেই পরিমাণ সার ঐ গাছে দেওয়া হচ্ছে।

তরল এমোনিয়া মাটিতে অতি সহজে ঢালা যায়। কিন্তু এত ঘন সার মাটিতে না ফেলে একটু তরল করে ঢাললে সুবিধা হয়। তাতে খেতের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মাটির কত নীচে সার দেওয়া হবে ।

সার মাটিতে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য যেন ঐ সারের মধ্যে যে সমস্ত গাছের খাদ্য জাতীয় পদার্থ আছে সেগুলি সহজেই গাছের গ্রহণীয় হয়। গাছ শিকড় দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে সুতরাং সার দেওয়ার

প্রধান উদ্দেশ্য যেন সহজেই এই সার গাছের শিকড়ের কাছে গিয়ে পৌছায়। সাধারণতঃ এমোনিয়াম জাতীয় সার মাটিতে ছড়িয়ে দিলেই চলে। যদি ছড়িয়ে দেওয়ার পর মাঠে একটু মই দিয়ে দেওয়া যায় তবে ভাল হয়। এর ফলে সার ১"-২" মাটির নীচে চলে যায়। পরে মাটির মধ্যে যে জলকণা থাকে তার সঙ্গে মিশে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাবে। শাক সব্জীর জন্য চূণ ও ফসফেট মিশিয়ে অন্ততঃ ৪" তলায় দিয়ে দেওয়া উচিত।

মাটিতে সার দেওয়ার সময়।

যথা সময়ে বীজ বপন না করলে যেমন ভাল ফসল পাওয়া যায় না তেমনি যথা সময়ে মাটিতে সার না দিলে সে সার গাছের কোন কাজে আসে না। অনেক সময় অনেক ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি হয় না, এরজন্য প্রথমেই দরকার কোন বিশেষ সারের গুণাবলী বিশেষ ভাবে জানা। মাটির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। সবার উপরে মাঠের ফসল সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে। যেখানে মাঠে খুব বেশী রকমের সার দিতে হয় সেখানে গাছ পুতবার বা বীজ ছড়াবার অন্ততঃ ৩ দিন আগে সার ছড়ান ভাল।

এমোনিয়াম সালফেট বা ঐ জাতীয় সহজ দ্রবণীয় সার অন্ততঃ ৩ দিন আগে ছড়িয়ে তারপর বীজ বপন করা উচিত। যতটা পরিমাণ সার দেওয়ার ইচ্ছে তার অর্দ্ধেকটা এই সময় ও বাকি অংশটা পরে গাছ একটু বেড়ে উঠলে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সুপার ফসফেট অন্ততঃ ১০ দিন আগে দিতে হবে। কারণ সুপার ফসফেট মাটিতে মিশতে সময় লাগে।